লাল
মেঘ

বুদ্ধদেব বসু

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

১

দরজার ঠিক বাইরে, সে থমকে দাঁড়ালো।

শাদা ঘর, ধবধবে। ঝকঝকে। ঝকঝক করছে খাট; নিভাঁজ, শাদা চাদরে ল্যাভেণ্ডারের ফিকে গন্ধ। আশ্চর্য, সে-গন্ধটা সব সময় কেমন লেগে রয়েছে, গন্ধের অদৃশ্য, পাৎলা ধোঁয়া বাতাসে ঝুলছে। মিষ্টি, অতি-সূক্ষ্ম মিষ্টি, মগজের ভিতর ছুঁচের মুখের মতো গিয়ে লাগে। রোগের বদগন্ধ রাখো দূরে ঠেলে। তবু: ঐ সব শিশি-বোতল। দেয়াল ঘেঁষে টেবিল, শাদা কাপড়ে ঢাকা। নানা আকারের, নানা ছাঁদের, নানা রঙের বোতল আর গেলাশ: বেলোয়ারি পসরা। অ্যালার্ম-ঘড়িটা তার শাদা, গোল মুখ নিয়ে নির্বোধের মত তাকিয়ে। কালো কাঁটা দুটো ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে, অবিশ্রান্ত ঘুরছে। কী করছে তারা, তারা জানে না। সময়ের ভার, সময়ের ভয়ংকর ভার। দুপুরবেলা শুয়ে-শুয়ে আমরা পাশ ফিরি, চোখ বুজি, দীর্ঘশ্বাস ফেলি; চেষ্টা করি ভাবতে, মনে করতে, আশা করতে; চেষ্টা করি ঘুমোতে। আর চারটে বাজবার এখনো দু-ঘণ্টা দেরি। এমন নয় যে একদিন একটু আগে চারটে বাজবে।

আর এই কাঁটা দুটো ঘুরতে-ঘুরতে একদিন একটা সীমান্তে এনে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়: অস্পষ্ট সীমান্ত, তারপর অন্ধকার। Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps life's

petty pace from day to day to the—কিন্তু সময় নেই। এগারোটায় একটা ক্লাশ। আর বিছানার একপাশে খানিকক্ষণ তাকে ব'সে থাকতেই হবে। বিছানাটা এত পরিচ্ছন্ন, তার ভালো লাগে না। বালিশের মধ্যে একটা গর্ত, কালো একটা মাথা সেখানে শোয়ানো।—ঠিক কালো নয়, বাদামি, শুকনো, জট-পাকানো। পাৎলা চুলগুলো পাটের মতো আলগা হ'য়ে আসছে। আর সমস্ত শরীর স্তব্ধ, এমন স্তব্ধ, একটু যেন ভাঁজ পড়ছে না চাদরে। কোনো ভার নেই যেন শরীরের। শিটিয়ে-যাওয়া, ঢিলে চামড়া। বড়ো-বড়ো দুটো চোখ কেমন একরকম জোর ক'রে তাকিয়ে। অমন ক'রে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়, বুজে যাওয়া উচিত। And all our yesterdays have lighted fools—ও শান্তি পাবে, যদি চোখ বুজতে পারে। আলো নিবে গেছে। এখন শুধু ইচ্ছা, শুধু ইচ্ছার ভয়ংকর, ঠাণ্ডা শক্তি। অনেক ভালো নয় কি অন্ধকার, অন্ধকারে মিশে যাওয়া? দাঁতে-দাঁত-লাগা এই নির্মম, ভীষণ ইচ্ছা—এ কি ফিরিয়ে আনতে পারবে সেই আলো, সেই আগুন? Put out the light, and then put out the light—আলো যদি একবার নিবে যায়, আবার তাকে জ্বালবে কে?

তার হাতে সরু ক'রে ভাঁজ করা খবরের কাগজের দিকে সে একবার তাকালো। ইংরেজ টেস্ট-দলের কাপ্তানের ছবি। কী স্বাস্থ্য, কী অজস্র, নির্লজ্জ স্বাস্থ্য। এ-রকম স্বাস্থ্য একটু অশ্লীল নয় কি? কেবল বেঁচে থাকাতেই যার আনন্দ, কেবল খাওয়ায় আর ঘুমে আর চলাফেরাতেই যার যথেষ্ট সুখ···সে কি সন্ধ্যাবেলায়

আলো জেলে বসবে শেক্সপিয়র পড়তে? একটুখানি অসুস্থ হওয়া —সে তো সূক্ষ্মমনা সভ্য মানুষের বিশেষ অধিকার। সে—জীবনের প্রতিটি দিন সে ঠিক সেইটুকু অসুস্থ যাতে শরীরের দাবী খুব প্রবল হ'য়ে উঠতে না-পারে। সে উপভোগ করেছে মানুষের সভ্যতার আরক্ত আশ্চর্য ফল: বই, ছাপার অক্ষরের মধুর, আশ্চর্য মধুর নিশ্বাস; উর্ধ্ব-উৎসুক জলন্ত আত্মার আগুনের মতো নিশ্বাস। রাজার মতো সে: সমস্ত সময় থেকে, সমস্ত দেশ থেকে তার কাছে আসছে অমূল্য, অপরূপ উপঢৌকন। দেখতে মোটেও জমকালো নয়, তবু রাজা। গায়ের রং কেমন ঘোলাটে: অসম্পূর্ণ নির্গমন।

Adequate mastication
Keeps away constipation,
And of Death's all deadly darts
The deadliest is constipation.

ছেলেবেলায় এই ছড়া তাকে শেখানো হয়েছিলো। কিন্তু বোধ হয় সে তার খাদ্য যথেষ্ট চিবোয়নি; তাড়াহুড়ো ক'রে খেয়েছে— তার রঙিন ছবির বই আবার খুলে বসবে, সেইজন্যে তাড়া।

And now I a martyr am
To con-, to con-, constipation,
This is the evil that must come
Of inadequate mastication.

ছোট্ট এই পদ্য—তার সমস্ত জীবন তার মধ্যে। আর এখন

সে নেবুর রস খাচ্ছে, আর শাক-পাতা, আর কাঁচা টম্যাটো; খাচ্ছে জল, গরম আর ঠাণ্ডা, আর নুন দিয়ে কুমকুমে গরম; স্নানের আগে দু-মিনিট নিশ্বাসের প্রক্রিয়া, স্নানের সময় কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে ব'সে থাকা। এ-সব করতে হয়—নিজের প্রতিও একটা কর্তব্য আছে বইকি। কিন্তু যা তার সমস্ত জীবনের অংশ হ'য়ে গেছে, এখন তাকে উপড়ে ফেলা কি সোজা! তার বয়েসে অভ্যেসগুলো সব শক্ত ক'রে মূল গেড়ে বসে, নড়ানো মুশকিল। শরীরটাকে নিয়ে বেশি নড়াচড়া করতে তার ভালো লাগে না। সে চায় চুপ ক'রে ব'সে থাকতে···আর পড়তে। আর তার শরীর তাতে বাধা দেয় না, শরীর নিজের জন্য বিশেষ-কিছু চায় না, যথেষ্ট সময় দেয় তাকে। রাত্তিরেও ভালো ঘুম হয় না তার। আর তাই তাকে আবার আলো জ্বালতে হয়—পড়তে হয়, আর-কী করলে সময়ের দুঃস্বপ্নকে ভু'লে থাকা যায়? ঘুম আসে না, কিছুতেই ঘুম আসে না। Let me not be mad, not mad sweet heaven! উন্মত্ততার যে-গহ্বর, তার ঠিক প্রান্তে উঁকি দিয়ে সে দেখেছে। এমন রাত্রি আসে, যখন তার স্নায়ুগুলো দু-হাতে তুলে নিয়ে কেউ যেন টুকরো ক'রে ছিঁড়তে থাকে। চুপ ক'রে শুয়ে থাকতে-থাকতে একটা ঠাণ্ডা আতংকে সে জ'মে যায়। আর তারপর একটা বই তুলে নেয়—সে বেঁচে যায়। ভোরের মৃদু নিশ্বাস তার মুখে হাওয়া করে, আস্তে-আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

মোটের উপর, এমন-কিছু খারাপ নয়, যা-ই হোক। যদি সে রোজ আট ঘণ্টা অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমোতো, যদি সমস্ত রকম সুখাদ্য

তার সহ্য হ'তো, যদি শরীরের সহজ, সবল চলাফেরার আনন্দ সে জানতো—তাহ'লে নিশ্চয়ই, সে যা হয়েছে, তা সে হ'তে পারতো না। এবং সে যা হয়েছে তা ছাড়া অন্য-কিছু, অন্য কোনোরকম হবার কথা ভাবতে পারে না সে। অনেক সে দেখেছে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের লোক—পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনের ছবির মতো দেখতে। খরগোশের মতো তাদের মস্তিষ্ক, শিশুর মতো চিন্তাহীন তাদের মন। দু-ঘণ্টা একভাবে ব'সে কিছু করতে হ'লে হাঁপিয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বিশেষ দয়া না-হ'লে সে-ও তাদের একজন হ'তে পারতো।

ভেজানো দরজাটার দিকে তাকিয়ে সে শরীরের ভার ডান পা থেকে বাঁ পায়ে বদলালে। কাছাকাছি কেউ নেই—কেউ তাকে দেখছে না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, একহাতে ভাঁজ-করা খবরের কাগজ। এতক্ষণে রোদ এসে পড়েছে খাটের পায়ার কাছে। কাঁধ পর্যন্ত উঁচু বালিশে ঠেশান দিয়ে শোভা ব'সে আছে, তার নাকটা ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের উপর। এককালে নাকটা দেখতে মন্দ ছিলো না, এখন তার মাংসহীন, ঢিলে মুখে কেমনতর খাপছাড়া ঠেকে। শীর্ণ হাতে খোঁচা-খোঁচা হাড় ফুটে উঠেছে। চুড়িগুলো খুলে নেয়া হয়েছে অনেক আগেই, শোভা নিজের হাতেই একদিন খুলেছিলো। সে যে কত শুকিয়ে গেছে তার অমন একটা প্রমাণ আর দরকার নেই। একটা প্রমাণ তবু রইলো; বাঁ হাতে তার শাঁখা, তার এয়োতির চিহ্ন, সূক্ষ্ম কাজ-করা ঢাকাই শাঁখা। জিনিশটা ছোট্ট আর সুন্দর; কিন্তু এখন তা দেখায়

যেন প্রকাণ্ড শাদা একটা চাকা দাঁত বের ক'রে রয়েছে। সেটা শোভা ছাড়বে না। যদি সে মরে, সেই শাঁখা আর কপালময় সিঁদুর নিয়ে মরবে, সধবার পরম গৌরব নিয়ে। মরতে-মরতেও সে ছাড়বে না তার স্ত্রীর-অধিকার। মরতে-মরতেও সে স্বামীকে বেঁধে রাখবে তার হাতে, ঐ শাঁখার শাদা চাকার মধ্যে—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্ত্রীত্বের সগৌরব বিজ্ঞাপন। মৃত্যুতেই কি এর সমাপ্তি—এ যে জন্ম-জন্মান্তরের।

'কেমন আছো? আজ কেমন আছো?' শোভা কিছু বলে না, বেশি কিছু বলবার শক্তিও তার নেই। তবু অবিনাশকে ব'সে থাকতে হয়। আর শোভা তার সেই বড়ো-বড়ো, জোর-ক'রে-মেলে-ধরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, তবু সে প্রাণপণে চোখ মেলে রাখছে, অবিনাশকে দেখতে। আর সেই তার স্তব্ধ, ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তার স্ত্রীত্বের ক্লান্তিহীন, বিস্মৃতিহীন অধিকার। সেই দৃষ্টি অসংখ্য অদৃশ্য প্রেত-হাতের মতো আঁকড়ে ধরে অবিনাশকে। ছাড়বো না, ম'রে গেলেও ছাড়বো না। আর এ-জন্মের যদি এখানেই শেষ, তাতেই বা কী: জন্মান্তরে তোমাকেই আবার পাবো।

অবিনাশ চুলের ভিতর দিয়ে একবার আঙুল বুলিয়ে গেলো, তারপর হাত বাড়িয়ে খুলতে গেলো দরজাটা। কিন্তু তার চুলে পাক ধরেছে। খানিক আগে, দাড়ি কামাবার সময়, নিজেকে খুব ভালো ক'রে সে দেখেছিলো। লোহা-রঙের চুল। কানের উপরকার চুলগুলোয় শাদার ছিটে। বয়েস তো পঁয়ত্রিশ হ'লো।

পঁয়ত্রিশ, লোহা-রঙের চুল। এটা ঠিক সে অকালেই বুড়িয়ে যাচ্ছে। আজকালকার মানুষ সহজে বুড়ো হয় না; পঁয়ত্রিশ বছরে তার চুলের রং বদলানো উচিত হয়নি। কিন্তু এই চুলের নিচে যে-খুলি, তার ভিতরকার জিনিশটা ভালো, খুব উঁচু দরের। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীতম ছাত্রদের একজন। অক্সফোর্ডের পয়লা নম্বরের ডিগ্রি। এণ্টন সাহেবের প্রিয় ছাত্র। সম্প্রতি, সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। খুলির ভিতরকার জিনিশটা তার জীবনে যথেষ্ট কাজে লেগেছে। উপরটায় লোহা-রঙের চুল।

'কেমন আছো? আজ কেমন আছো, শোভা?'

সেই মস্ত, শাদা বিছানায়, বালিশের স্তূপে হেলান দিয়ে, শোভা একটু নড়লো না পর্যন্ত। রোজ সকালে তার দিকে তাকিয়ে অবিনাশের মনে হয় যেন সে ম'রে গেছে। তেমনি তাকে দেখায়, তার শীর্ণ, হাড়ময় শরীর, তার সংকুচিত ফাঁপা বুক, কাঁধ দুটো চোখা হ'য়ে উঁচিয়ে আছে। কেবল চোখ দুটো জীবন্ত; বড়ো-বড়ো, স্থির-নিবদ্ধ চোখ। আশ্চর্য ভাইট্যালিটি, ডাক্তাররা বলছে, জীবনের উপর আশ্চর্য দখল। এখনো যে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে, সেটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কোনো কৃতিত্ব নয়, তারই বাঁচবার ইচ্ছার ফল মাত্র। কী নিষ্ঠুর, কী ভয়ংকর এই ইচ্ছা—যা তাকে কিছুতেই মরতে দেবে না। কিছুতেই মরবে না সে, দাঁতে দাঁত চেপে প'ড়ে থাকবে। আশ্চর্য! দাঁতে দাঁত ঘষার অস্ফুট আওয়াজ অবিনাশ যেন শুনতে পায়, আর তার মেরুদণ্ড শিরশির ক'রে ওঠে।

অবিনাশ তার হাতের উপর একটু হাত রাখলো, তারপর পায়ের দিকে স'রে এসে বসলো। খুব ক্ষীণস্বরে শোভনা বললে, 'তোমার শরীর ভালো দেখাচ্ছে না।'

তার নিজের শরীরের যে প্রায় অস্তিত্বই নেই, তার চেয়েও বেশি ভাবনা স্বামীর শরীর যে একটু খারাপ হয়েছে। তার স্বামীর শরীর—তা তো তার, তার হাতের রচনা। সে-ই তো এতদিন ধ'রে তাকে লালন করেছে, তার সেবায়, তার যত্নে, তার প্রতি মুহূর্তের আত্ম-দানে। সে-ই তো বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। আর আজ চার মাস ধ'রে সে শুয়ে আছে, তবু অবিনাশ কোনো-একরকম ক'রে শরীরটাকে যে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে, সেটাই যেন আশ্চর্য। শোভার হাত থেকে স্খলিত হ'য়েও তার শরীর একই অবস্থায় থাকবে, এমন স্পর্ধা কী ক'রে তার হ'তে পারে?

তাই সে বললে, 'হ্যাঁ, শরীরটা আজ ভালো নেই।'

'না-হয় কিছুদিনের ছুটি নাও কলেজ থেকে।'

'কী হবে তাতে?'

'শরীর সারবে। তোমার খাওয়ারও তো কোনো যত্ন হচ্ছে না আজকাল।'

সে-কথা সত্যি নয়, কিন্তু তা বললে শোভা বিশ্বাস করবে না। অন্তত, বিশ্বাস করতে চাইবে না; বিশ্বাস করতে পারলে সুখীও হবে না।—'তুমি এখন ও-সব কিছু ভেবো না,' হাতের খবর-কাগজটার পাতা উল্টিয়ে অবিনাশ বললে, 'আস্তে-আস্তে ভালো হ'য়ে ওঠো।'

শোভনা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিছু না-ব'লে ও-কথায় সায় দিলে, মেনে নিলে কথাটা। এখনো তার আশা আছে। দাঁতে-দাঁত-বসানো ইচ্ছার জোর। এখনো জীবনকে সে এতটুকু ছাড়তে পারছে না। তার বাড়ি। তার সংসার। সমস্ত জড়িয়ে গেছে তার ইচ্ছার জালে; এই রোগের নেপথ্যে ব'সেও লুকোনো মাকড়শার মতো চলেছে তার জাল বোনা। সে যদি ছেড়ে দিতে পারতো, যদি ভুলতে পারতো—যেটা কষ্টের, সেটাকে নিজের ইচ্ছা দিয়ে আরো বেশি কষ্টের ক'রে তুলছে কেন সে?

শোভনা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, আর-কিছু সে বলবে না। অবিনাশ মাথা নিচু ক'রে খবর-কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলো। খালি হাতে চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় না। মুখের উপর অনুভব করলো স্ত্রীর নির্নিমেষ প্রেত-দৃষ্টি। খবরের কাগজ দিয়ে সে মুখ ঢাকলো যতটা পারলো। অস্বস্তিকর, মৃত্যুর প্রান্ত থেকে সেই দৃষ্টি। যথেষ্ট কি হয়নি? জীবনে কি যথেষ্ট হয়নি যে ঘনিয়ে-আসা মৃত্যুতেও জাগিয়ে রাখতে হবে এই তৃষ্ণার চোখ? কে তার চোখ বুজিয়ে দেবে? তাকে ঘুম পাড়াবে কে? নামতে দাও অন্ধকার: ডুব দাও বিস্মৃতির কালো জলে, সেখানে শান্তি।

খশখশ শব্দ ক'রে কাগজটা সে আর-একবার ওল্টালে। Marriage settled start tomorrow father: পাৎলা হলদে কাগজে অস্পষ্ট, নীল হাতের লেখা। ঠিক সেই সময়ে, সে গভীরভাবে মগ্ন হ'য়ে ছিলো কার্লাইলে। টেলিগ্রামটা চোখের সামনে ধ'রে বার-বার, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে তাকিয়ে দেখেছিলো—

যদি দৈবাৎ অন্য-কোনো অর্থ বেরিয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে ঠাট্টা। কিন্তু ঠাট্টা নয়। Marriage settled start tomorrow father. গেলো ছুটিতে সে যখন বাবার কাছে গিয়েছিলো, তিনি তার বিয়ে সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলেছিলেন। অবিনাশ শুনে গিয়েছিলো, কিছু বলেনি। অশ্রদ্ধায় চুপ ক'রে ছিলো, তা নয়। বিষয়টা এমন নয়, যা নিয়ে সে উৎসাহিত হ'তে পারে। তার মনে কোনোরকম আঁচড়ই সেটা কাটেনি। ভিক্টরীয় যুগের গদ্য-সাহিত্য নিয়েই তার মন তখন বড়ো বেশি ব্যাপৃত।

আর কার্লাইলের পৃষ্ঠা থেকে উঠে এলো তার বাবার গম্ভীর, প্রসন্ন মুখচ্ছবি। বাবাকে সে চিরকাল ভয় করেছে—আর ভালো-বেসেছে। মনে-মনে গভীর শ্রদ্ধা করেছে তাঁকে। পণ্ডিত লোক তিনি। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, এমন ভালো বাপ নেহাৎ কপাল-গুণে পাওয়া যায়। তার মা ছিলো না—মা-কে তার মনে পড়ে না, কি অস্পষ্ট একটুখানি মনে পড়ে। ছেলেবেলায়, বাবাই ছিলেন তার মা-র মতো। তার আর ভাই-বোন ছিলো না, বাবা ছিলেন তার খেলার সঙ্গী। বিধবা এক পিসিমা থাকতেন বাড়িতে, কিন্তু তার মনের কোনো টান পড়েনি তাঁর উপর। বাংলাদেশের এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়, সে ঘুরে বেড়িয়েছে বাবার সঙ্গে। বই, ছবি; মস্ত একটা কাঠের ঘোড়া, যাতে চ'ড়ে মনে-মনে সে কোথায় চ'লে যেতো, কত মাঠ পেরিয়ে কোন ঘন বনের ধারে; গাছের সঙ্গে খাটানো দড়ির দোলনা আকাশে উঠে যেতো, ভয়ে বুজে আসতো তার চোখ—

আর কী ভালো লাগতো সেই ভয়। তার ছেলেবেলায় অনেক-কিছুরই অভাব ছিলো, তবু অসুখী সে ছিলো না। একা-একা তার খেলা, একা-একা কথা বলা—অদ্ভুত, একটু খাপছাড়াভাবে সে বড়ো হ'য়ে উঠেছিলো। যা সে চাইতো, তা-ই পেতো; না-চাইতে পেতো তার ঢের বেশি। ছেলেবেলায়, বাবা তার সমস্ত জীবন ভ'রে রেখেছিলেন। তিনি পড়তেন তার সঙ্গে ব'সে; তার শৈশবের সেটাই পরম সুখের স্মৃতি। শীতের কুয়াশা-মাখা সকালবেলায় সে বেড়াতে বেরোতো তাঁর হাত ধরে'—অবিরল, তরল তাদের কথা—আর সে হয়তো কখনো হাত ছেড়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে গেছে এগিয়ে, তিনিও ছুটে এসেছেন পেছনে। এখনো কুয়াশার সেই ক্ষীণ গন্ধ সে মনে করতে পারে।

বড়ো হ'য়ে সে চ'লে এলো কলকাতায় কলেজে পড়তে, আর বাবা একা-একা এখান থেকে ওখানে ঘুরছেন। যে-কাজে তিনি তাঁর জীবনটা দিলেন, সে তখন বুঝতে পারলো, সেটা মোটেও তার যোগ্য নয়। তাঁর কথা ভেবে তার কষ্ট হ'তো, মফস্বলের অন্ধকারে ব'সে দিনের পর দিন রায় লিখে যাচ্ছেন। আর এমন একা! তবু—তাঁর সঙ্গে যখনই দেখা হ'তো, তাঁর মুখে প্রশান্তির আভা।

টেলিগ্রামটা বইয়ের মধ্যে গুঁজে হস্টেলের সেই ছোট ঘরে ব'সে-ব'সে সে ভাবলে, ভাবলে। কিন্তু ভাববার কিছু ছিলো না; বাবা যা বলেছেন তা তাকে করতে হবে। করতেই হবে। যদি সে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, তার শেষ কোথায়? বাবা কি অন্যায় করছেন তার প্রতি? সে কি ফিরে তার ক'রে দেবে···কী

বলবে ? না কি গিয়ে জোর গলায় জিগেস করবে, 'এর মানে কী ?' মানেটা তো স্পষ্ট। কী তাকে করতে হবে সেটা খুবই স্পষ্ট। ভাবনা ছেড়ে দিয়ে সে শুতে গেলো। আর পরের দিন সে রওনা হ'য়ে গেলো দিনাজপুরে ; তার বাবা তখন সেখানে।

যেদিন পৌঁছলো, সেই সন্ধ্যাতেই সেই মহিলার সঙ্গে তার দেখা হ'লো, কয়েকমাস পরেই যিনি তার বিমাতা হলেন। বিধবা, তিরিশের উপরে বয়েস। মুখে মর্যাদার ছাপ। একটু মোটা, কিন্তু সব জড়িয়ে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়নি। শান্ত, নরম স্বরে কথা বলেন—ভারি ভালো লাগে শুনতে। অবিনাশের প্রথম পরিচয়েই তাঁকে ভালো লাগলো। ওখানকার মেয়ে-স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস ; তার বাবার কাছে স্কুল-সংক্রান্ত কী কাজে যেন এসেছিলেন। কিন্তু তিনি বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়ে গেলেন, অবিনাশ সুযোগ পেলো তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার।

রাত্রে খাওয়ার পর বাবা বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলবো।'

তখন পর্যন্ত কিছু জিগেস করবার কি শোনবার সুযোগ তার হয়নি : সে চুপ ক'রে রইলো, সমস্ত শরীর শ্রুতিময়।

'এই যে মিসেস দাস—এখানকার হেড-মিস্ট্রেস—' বাবা থেমে গেলেন।

'চমৎকার মহিলা,' তাকে বলতে হ'লো।

'আমি ভাবছি তাঁকে বিবাহ করবো,' অত্যন্ত সহজভাবে বাবা বললেন।

অবিনাশ চমকে উঠলো, মুহূর্তের জন্য, একটুখানি চমকে উঠলো। বাবার বয়েস তখন সাতচল্লিশ। পনেরো বছর স্ত্রীহীন জীবন তিনি কাটিয়েছেন। ছেলেকে দিয়েছেন তাঁর জীবন। কিন্তু এখন ছেলে বড়ো হয়েছে, ছেলে থাকে দূরে। ছেলে তার নিজের স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ করবে—বেশি দেরি নেই তার। এতদিনে কি নিজেকে তাঁর একা মনে হ'তে আরম্ভ করেছে? কিন্তু সত্যি—সমস্ত জীবন ভ'রে তিনি কী একা, কী ভয়ানকরকম একা! মফস্বলের অন্ধকারে ব'সে কেবল রায় লিখলেন! বড়ো হবার পর অবিনাশ অনেক সময় ভেবে অবাক হয়েছে যে তিনি আবার বিয়ে করেননি। উচিত ছিলো বিয়ে করা। হয়তো অবিনাশের শৈশবও আরো সুখী হ'তো তাতে। আমাদের দেশের একটা কুসংস্কার—এই বিমাতা ব্যাপারটা। বাবা সেটা এড়াতে পারেননি। আর নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়েছে: তারই জন্যে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করলেন সমস্ত জীবন। কোনোরকম সংকট তিনি আনতে চাননি ছেলের জীবনে। মিথ্যা, মিথ্যা সংস্কার। আর আজ—ছেলে যখন যৌবনে উপনীত, এতদিনে তিনি মুক্তি পেলেন। মুক্তি নিতে পারলেন। অবিনাশ মনে-মনে খুব খুশি হ'লো। শুধু একটা কথা ভেবে তার খারাপ লাগলো যে বাবা অনেক আগেই এটা করেননি।

'কিছু বলছো না কেন?' একটু পরে বাবা আবার বললেন। 'তোমার যদি কোনো আপত্তি থাকে—'

'না, আপত্তি থাকবে কেন? ভালোই তো।'

'মন থেকে বলছো?'

'তুমি যাঁর কথা বললে, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অত্যন্ত সুখের কথা ব'লেই মনে করি।'

'সত্যি তোমার মনে কোনো কুণ্ঠা নেই?'

'সত্যি নেই।'

বাবা একটু চুপ ক'রে ভাবলেন।

'সেইজন্তেই তোমার এখন বিয়ে করা দরকার।'

'সেইজন্তেই—' অবিনাশ ভুরু তুলে তাকালো।

'এটা তো বুঝবে যে আগে তোমার বিয়ে না-হ'লে—'

'তাহ'লে করবো বিয়ে,' অবিনাশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো। যুক্তিটা কতদূর টেকসই, একবারও ভেবে দেখলে না। শুধু তার মনে হ'লো, বাবা সমস্ত জীবন নিজেকে বঞ্চিত রেখেছেন, আর নয়। আর সে বাধা না হয় যেন।

'তাড়াতাড়ি জবাব দেবার দরকার নেই, ভেবে ত্থাখো। আমি তোমাকে তার ক'রে আনিয়েছি বটে, কিন্তু এখনো বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া যায়।'

'ভেবে দেখবার কিছু নেই,' সে বললে।

'এখানকার মুন্সেফ তারিণীবাবুর মেয়ে। সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু অন্যান্য সব দিক থেকে—'

'তুমি মনে-মনে যেমন ঠিক করছো, তেমনি হবে, বাবা,' অবিনাশ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো।

'কেবল আমাকে খুশি করার জন্তে কিছু করবার দরকার নেই।'

অবিনাশ বাবার মুখের দিকে তাকালো, মিসেস দাসের কথা ভাবলো।—'আমি খুশি হইনি এ-কথা তোমাকে কে বললে?'

শোভনাকে বিয়ে ক'রে সাতদিন পর সে ফিরে এলো কলকাতায়। হস্টেলের ছোট ঘর তাকে অভ্যর্থনা করলো। শক্ত চেয়ারটায় ব'সে একটা নিশ্বাস পড়লো তার। শান্তির নিশ্বাস।

আগের রাত্রে শোভনা তাকে বলেছিলো, 'গিয়ে চিঠি লিখবে?'

'লিখবো।'

'গিয়েই লিখবে?'

অবিনাশ চট ক'রে কোনো জবাব দিতে পারেনি। একটু অবাক হয়েছিলো মনে-মনে। মনে-মনে তার এই স্ত্রী সম্বন্ধে কোথায় যেন তার একটা ভয়। শোভনার বয়েস প্রায় সতেরো, বেশ বড়ো-সড়ো দেখতে, খোলা-মেলা নিঃসংকোচ মুখ। বিয়ের জন্য অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো সে। মনে-মনে অনেকদিন থেকেই সে স্ত্রী হ'য়ে আছে। এক মুহূর্তে সে অবিনাশের স্ত্রী হ'য়ে উঠলো; দু-দিনেই যেন অবিনাশকে নিলে দখল ক'রে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তারা দু-জন যে পরস্পরের সব চেয়ে আপন, সেটা এরই মধ্যে বেশ ভালো ক'রেই সে জেনে ফেলেছে। তার দিকে তাকিয়ে, তার কথা শুনে অবিনাশ যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো, নিজেকে তার মূঢ় মনে হ'লো।

'আবার কবে আসবে?' শোভনা জিগেস করলে।

'গরমের ছুটি আসুক।'

'মাঝখানে দু-তিনদিনের কোনো ছুটি নেই ?'

'দেখি না তো।'

'ছুটি হ'লেই আসবে ?'

স্পষ্ট এক-একটা প্রশ্ন, হাতুড়ির ছোটো-ছোটো আঘাতের মতো। হাতুড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে পিটিয়ে শোভনা স্বামীর মনের মধ্যে পথ ক'রে নিচ্ছে। ঠুক্, ঠুক্…সে থামবে না, যতক্ষণ না সে তৃপ্ত হ'তে পারে, নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। যতক্ষণ না তার স্বামীকে নিশ্চিত নির্ভুল ক'রে পেতে পারে তার প্রবল, প্রসারিত স্ত্রী-সত্তায়, তার শরীরের প্রাণ, তার সমস্ত জীবন, মুঠোর মধ্যে তার হৃৎপিণ্ড।

'চুপ ক'রে আছো কেন ? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না ?'

পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের জোর এই প্রশ্নে। শোভনা জানতো ভালোবাসায় তার অধিকার। আর এই প্রশ্ন, এই দাবি, প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে জেগে রয়েছে, অবিনাশের সমস্ত জীবন ভ'রে। নিঃশব্দে মেলে-ধরা বড়ো-বড়ো চোখের অপরিসীম তৃষ্ণা। তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না ? তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না ? এই রুদ্ধ স্বর ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। থেকে-থেকে বেজে উঠছে দীর্ঘশ্বাসের মতো। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে চায়, ছিঁড়ে ফেলতে চায় তাকে, তার সমস্ত শরীর নিংড়ে হৃদয়ের রক্ত শোষণ ক'রে নিতে চায়—এমন নিষ্ঠুর এই তৃষ্ণা, এমন তৃপ্তিহীন। যদি এখন, এই মুহূর্তে খবরের কাগজ থেকে সে চোখ তুলে তাকায়, তাহ'লে এই প্রশ্নকেই মুখোমুখি দেখবে। নগ্ন আর তীক্ষ্ণ আর

নিষ্ঠুর : নিজের প্রতি সব চেয়ে নিষ্ঠুর, নিজেকে কখনো ভুলতে না-পারার পরম নিষ্ঠুরতা।

দরজাটা আস্তে খুলে গেলো। সন্ধ্যামণি। আধ-ময়লা শাড়ি, মুখে শারীরিক ক্লেশের পাৎলা ছায়া। আঁচল দিয়ে সে মুখ মুছলো একবার, তারপর নিঃশব্দে কোণের টেবিলে গিয়ে শিশি-গেলাশ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলো। নিপুণ, নির্ভুল আঙুল। ডাঁটওয়ালা গেলাশে ক'রে লাল রঙের একটা ওষুধ নিয়ে এসে ধরলো শোভনার মুখের কাছে।

'বৌদি।'

একটি কথা না-ব'লে শোভনা ওষুধটা খেয়ে ফেললো। সন্ধ্যামণির অন্য হাতে ধরা জলের গেলাশে চুমুক দিলো একটু। পাখির মতো ঠোঁট। অল্প একটু শব্দ ক'রে জলটা তার কণ্ঠনালী গিয়ে নেমে গেলো। ওষুধে তার বিশ্বাস প্রায় কুসংস্কারের শামিল। কয়েক বছর আগে হ'লে, এ-বিশ্বাস গিয়ে পড়তো মন্দিরের জলে আর পুজোর পাতায়, আর স্বপ্নে-পাওয়া মাদুলিতে। মোহের বদলে মোহ। মোহ নিয়েই তো আমরা বাঁচি।

সন্ধ্যামণি গেলাশ ধুয়ে ফিরিয়ে রাখলো টেবিলে। জানলা দিয়ে স্রোতের মতো রোদ। 'বৌদি, পরদাটা টেনে দেবো ?'

'না, থাক।'

সন্ধ্যামণি টেবিলের ধারে আরো একটু দাঁড়িয়ে রইলো, এটা-ওটা ঠিকঠাক করলে। তারপর ফিরে এসে জিগেস করলে, 'অবি-দা, তুমি কি এখন খাবে ?'

চোখ নামিয়ে নিলো অবিনাশ। খবরের কাগজটা তার কোলে, এতক্ষণ তার চোখ সন্ধ্যামণিকে অনুসরণ করছিলো। হঠাৎ সে সচেতন হলো, চোখ নামিয়ে বেক্‌স্‌ বিয়রের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকালো। 'যাচ্ছি, একটু পরে।'

সন্ধ্যামণি ঘর থেকে চ'লে গেলো, দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে। একটা লম্বা আঙুল বার্নিশ-করা কাঠের গায়ে মুহূর্তের জন্য লেগে রইলো। গেলো মিলিয়ে, আর অবিনাশ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলো আধ-ময়লা আঁচলটা জড়াতে-জড়াতে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। রান্নাঘরে তার নানারকম কাজ। অবিনাশের টম্যাটো-স্যুপ আর মাগুর মাছের ঝোল আর টকপালঙের অম্বল… টেবিলের ধারে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। অবিনাশের উচ্চশ্রেণীর মস্তিষ্কের সংরক্ষণ—তার ব্যবস্থা করতেই হবে। আহার সম্বন্ধে তার অভ্যেসগুলো ছাড়লে চলবে না। সন্ধ্যামণি আছে।

ভাবতে অবাক লাগে। শিশুদের সঙ্গে কোনোদিন সে ভালো মিশতে পারতো না, কিন্তু সন্ধ্যামণির সঙ্গে তার গভীর বন্ধুতা দু-দিনেই। তার বিমাতার দিদির মেয়ে, একবার মা-র সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলো তাদের বাড়িতে। ছোট্ট, ঝিকঝিকে মেয়ে—ফুর্তিতে, কৌতূহলে, চঞ্চলতায় ভরা। সবুজ একটুখানি প্রাণস্রোত। অবিনাশের বই-পড়া চোখ অবাক হ'য়ে গেলো। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো সেই অপরূপ রহস্য যার আমরা নাম দিয়েছি শিশু। আর মণিও কী ক'রে বুঝতে পারলে তার আকর্ষণ… লোকে বলে যে পশুর আর শিশুর এ-সব প্রবৃত্তি খুব বেশিরকম জাগ্রত। অবিনাশ

তাকে ছবি দেখাতো, সুর ক'রে পদ্য প'ড়ে শোনাতো তাকে, লুডো খেলে সময় নষ্ট করতো। মণি অবিশ্রান্ত কত-কী ব'লে যেতো, ভালো ক'রে সব শুনতো না, শোনবার দরকারও করতো না। শুধু ঝিরঝিরে জলের মতো তার শিশু-স্বর ব'য়ে যেতো তার মনের উপর দিয়ে। যে-জীবন সে কাটিয়ে এসেছে তা অনেকটা বিচ্ছিন্ন, বলতে গেলে নিজের মধ্যে আবদ্ধ, বই দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ এই শিশুর মধ্যে সে যেন সবুজ, উন্মুক্ত জীবনের স্পর্শ পেলো।

কিন্তু তার স্ত্রী—হ্যাঁ, তার স্ত্রী অবশ্য ছিলো। কিন্তু স্ত্রীর মধ্যে সেই মুক্তি সে পায়নি; কোনোখানে হঠাৎ একটা বাঁধ খুলে গিয়ে সমস্ত জীবনের স্রোত হঠাৎ দুরন্ত বেগে তার মুখে এসে লাগেনি। বিবাহের অনতিপরবর্তী উচ্ছ্বাস যে না ছিলো তা নয়। কিন্তু সবই যেন জানা কথা, আগে থেকে ঠিক-করা, সবই একটা বিরাট ও অনতিক্রম্য নিয়মের অংশ। ভালো যে লাগতো না এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না; কিন্তু ভালো যে লাগবেই তা যেন অনেক, অনেক আগে থেকেই ঠিক হ'য়ে গেছে—তা তারা জানে না, তার উপর তাদের কোনো হাত নেই। অবিনাশ সেটা মেনে নিয়েছিলো, খামকা মনকে বিক্ষোভে ফেনিয়ে তোলেনি। যা-ই বলো না, বিয়ে তো জীবনের একটা অংশমাত্র, সমস্ত জীবন নয়। আর, যদি ভাবতেই বসো, বিয়ে তো এইরকমই। তার মনে কোনো নিজস্ব ধারণা ছিলো না: সে কিছু ভাবেনি, কিছু আশা করেনি। তাছাড়া তার বয়েস তখন মাত্র কুড়ি, সে-বয়েসে

যে-কোনো যুবতীর সাহচর্য মনকে খানিকটা লুব্ধ ও উত্তেজিত ক'রে তোলে। নিজেকে মানিয়ে নেয়া কঠিন হয়নি তার পক্ষে।

শ্বশুরের গৃহ শোভনার খুব ভালো লাগতো না। বিশেষ, তাঁর এই 'বিসদৃশ' বিবাহের পরে। 'আমার কলকাতায় গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে,' প্রায়ই সে বলতো।

'কোথায় থাকবে সেখানে?'

'কেন, তুমি থাকবে।'

অবিনাশ নির্বোধের মতো বলেছে, 'আমি তো হস্টেলে থাকি।'

'চিরকালই হস্টেলে থাকবে নাকি তাই ব'লে? চাকরি করবে না?'

'চাকরি তো করতেই হবে।'

'তুমি তো ইচ্ছে করলে এখনো থাকতে পারো আমাকে নিয়ে। তুমি বললেই তোমার বাবা বাসা-খরচ দেন।'

'কেন, এখানে কি তোমার অসুবিধে হয়?'

'অসুবিধের জন্যেই বুঝি! তা এ-ও ঠিক, তোমার বাবার কি এখন আর তেমন টান থাকবে ছেলের উপর!'

'কেন থাকবে না?'

'এই তো দিদিকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনানো হয়েছে, আস্তে-আস্তে আরো কত হয়, ত্যাখো না।'

'কী বলছো তুমি!'

'থাক, থাক, আর বলবো না। ব'লেই বা কী হবে, তুমি তো বুঝবে না কিছু।'

কিন্তু শোভনাকে সে বুঝলো। তার মাথা ঠাণ্ডা—স্ত্রীলোকের মাথা ঠাণ্ডা না-হ'লে কি আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম? সে তার জীবন চায়, তার ঘর, তার সংসার। এখানে আর-একজন স্ত্রীলোক—যাকে মনের মধ্যে সে শাশুড়ি ব'লে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না; এবং মানুষের-সঙ্গে-মানুষের সম্পর্কে যে-স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, সেটাও চাপা পড়ছে সেই শাশুড়িত্বের স্থানে ও নামে। এখানে যেন তার নিজের জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই। পৃথিবীতে ঠিক তার নিজের জায়গাটি কোথায়, অনেক আগেই সে তা ভালো ক'রে বুঝে নিয়েছে। মনে-মনে আরো অনেক রকমের হিশেব সে অবিশ্যি করেছে—স্ত্রীলোকের হিশেবে কখনো ভুল হয় না। বাপের যে-টাকাটা এতদিন শুধু অবিনাশেরই ছিলো, এখন তা থেকে মোটা একটা অংশ তো খ'সে পড়লোই, আরো অনেক ছোটো-ছোটো ভাগ হওয়াও আশ্চর্য নয়। শোভনার মনে যে এটা লাগবে তাতে সে অবাক হ'লো না, মনে-মনে একটু হাসলো শুধু।

না, শোভনাকে সে দোষ দিলো না। মনের মধ্যে খুব একটা পাকা ব্যবসাদার না থাকলে কল্যাণী করুণাময়ী নারী হওয়া যায় না। নিজে অসুস্থ হ'য়ে পড়লে কি সেবা করা যায়? উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়ি সামলে চলবে কেমন ক'রে, যদি নিজের মধ্যেই থাকে নেশার ঝোঁক। স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, সাবধানী—প্রয়োজন হ'লে নিষ্ঠুর, যাতে স্বগৃহের পরিমণ্ডলের মধ্যে সে বিকীর্ণ করতে পারে তার সেবা, তার স্নেহ, তার কল্যাণ। তাহ'লেও, ও-সব কথা শুনতে অবিনাশের অত্যন্ত খারাপ লাগে, আর শোভনা

সেটা বুঝতে পারে। বেশি বলে না তাই। কিন্তু মনে-মনে সে যা ভাবে, তা সে না-ভেবে পারে না: ঈশ্বর তাকে অন্যরকম ক'রে তৈরি করেননি।

পরের বছর, পাশ ক'রে বেরিয়েই অবিনাশ কলকাতারই এক কলেজে চাকরি পেলো। শোভনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো, এটা ভেবে তার ভালো লাগলো। স্ত্রীর প্রতিও তার কর্তব্য আছে। যেটা কর্তব্য, সেটা তাকে করতেই হবে। আর শ্যামবাজারের সরু গলির সেই দোতলার ফ্ল্যাটে, শোভনার উন্মীলন লক্ষ্য ক'রে সে মুগ্ধ হয়েছিলো। তার বাড়ির উপর, তার জিনিশপত্রের উপর, তার সংসারের তুচ্ছতম অংশের উপর কী প্রচণ্ড তার দরদ। তার! একটা টেবিল, একটা আয়না, একটা কড়াই আমার, এ-কথা ভেবে মানুষ যে এমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতে পারে, সেই একটা অভাবিত শিক্ষা হ'লো অবিনাশের।

শোভনার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভ'রে তুলতে এখন কেবল একটি দুটি ছেলেপুলের দরকার। কিন্তু হ'লো না; ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন অন্যরকম। অবশ্য সন্তানের অভাবে নিজেকে অসুখী হ'য়ে উঠতে দিলো না সে। তার আছে বাড়ি। সেই বাড়ি নিয়েই সে সুখী, সে সম্পূর্ণ। প্রতিদিনের নানা আয়োজনে, নানা সংগ্রামে দু-হাতে সে তা রচনা করেছে। তার নিজের জীবন সঞ্চারিত করেছে তাতে। কত রকম ছোটোখাটো খরচ বাঁচিয়ে পয়সা জমিয়েছে—কিসের জন্যে, কেউ জানে না। টাকা-পয়সার তেমন টানাটানি কখনো হবে, এমন আশঙ্কা নেই: তবু দুটো

পয়সা নিয়ে ফেরিওলার সঙ্গে পনেরো মিনিট ধ'রে তার তর্ক, বাজারের হিশেব নিয়ে চাকরের সঙ্গে রোজ বচসা।

'কেন মিছিমিছি ও-রকম করো,' অবিনাশ কোনোদিন হয়তো বলেছে, 'চাকর-বাকররা কিছু নেয় তা তো জানোই।'

'নেয় তো জানি; কিন্তু কিছু না-বললে তো ডাকাতি আরম্ভ করবে। এই তো কাল চেপে ধরতে হঠাৎ পয়সা বেরিয়ে পড়লো—বলে কিনা, ভুল হয়েছিলো—'

'আহা—তুমিই বা চারটে পয়সার জন্যে কেন—'

'কেন, চারটে পয়সাই বা কম কী? খরচ করো যত খুশি, ঠকবে কেন? খামকা একটা পয়সারই বা লোকশান হবে কেন?'

ভেবে দেখতে গেলে, কথাটা খুব খাঁটি। কিছু বলবার নেই উত্তরে। সত্যি, ব'সে-ব'সে কেবল ঠকছি, এতে কোনো মাহাত্ম্য নেই। পৃথিবীর সব লোক প্রতি মুহূর্তে আমাকে ঠকাতে উদ্যত, এ-কথা সব সময় মনে ক'রে রাখাই যা-একটু কষ্টের। কিন্তু এ-কথা ভুলে গেলে নিপুণ গৃহস্থালি হয় না। বাইরের সমস্ত পৃথিবীর উপর অবিশ্বাসের ফলেই নিজের সংসারে আসে শ্রী, আসে নিশ্চিত কল্যাণ। আর তাই, ধূর্ত পৃথিবীর মুখ থেকে কেড়ে-কেড়ে শোভনা ভ'রে তুলবে তার সঞ্চয়ের ঝুলি: কোনো কাজেই হয়তো লাগবে না—শুধু, আমার কিছু টাকা আছে, মনে-মনে এ-কথা বলতে পারার তৃপ্তি।

'তোমার খাবার সময় হ'লো না?' অনেকক্ষণ পর শোভনা কথা বললো।

অবিনাশ একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসলো।—'যাচ্ছি।'

'আজকাল ইচ্ছে-মতো খুব অনিয়ম করছো তো?'

'একটু অনিয়ম না-হয় হ'লোই।'

'আর যা-ই করো, খাওয়ার সময়টা রেখো।'

নিয়মগুলো সবই প্রায় থাকছে, শোভনাকে এ-কথা সে বলতে চায় না। সমস্ত টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেছে, বাড়ি ভ'রে বিশৃঙ্খলা। চাকর-বাকররা দু-হাতে লুটছে, রান্না মুখে দেয়া যায় না। সমস্ত দীর্ঘ রোগ ভ'রে শোভনা শুয়ে-শুয়ে এই সব ভেবেছে। এই বাড়ির ক্ষুদ্রতম সামঞ্জস্য সে নিজের হাতে, নিজের জীবন দিয়ে সৃষ্টি করেছিলো; আজ তার অভাবে সমস্ত চুরমার হ'য়ে ভেঙে পড়বে না,—এমন অকৃতজ্ঞ এ-বাড়ি কেমন ক'রে হবে?

অবিনাশ উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি কিছু ভেবো না, তুমি ভালো হ'য়ে উঠলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' এখনো, এখনো তাকে এ-কথা বলতে হয়—প্রায় রোজ একবার ক'রে। তুমি ভালো হ'য়ে উঠলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। শোভনার রেখা-পড়া শক্ত কপালের উপর সে হাত রাখলো।

'শোনো—'

অবিনাশ শিয়রের ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো।

'আমার অসুখে তোমার শরীর পর্যন্ত ভেঙে গেলো।'

এ-কথা সে কেমন ক'রে বলবে যে সে বেশ ভালোই আছে—অন্তত, আগেকার চাইতে বেশি কিছু খারাপ হয়নি। চুপ ক'রে রইলো।

'আর এতগুলো টাকা নষ্ট—'

'ভালোই তো,' অবিনাশ মুখের উপর হাসি টেনে আনলো। 'আজকালকার কথাই তো হচ্ছে—বেশি খরচ করো, দেশের দুরবস্থা তাহ'লেই ঘুচবে।'

'কত টাকা গেলো সবসুদ্ধু? হাজার?'

'পাগল! কী যে বলো।'

শোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলো। মনে-মনে যেন বললে, জানি, জানি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশের কষ্ট হ'লো। এতগুলো টাকা, এতগুলো টাকা নষ্ট! তার আত্ম-অভিশাপের উত্তপ্ত নিশ্বাস যেন অবিনাশের মুখে এসে লাগলো—তার কাছে, শিয়রের ধারে দাঁড়িয়ে।

'তুমি মন-খারাপ কোরো না, তুমি কিছু ভেবো না,' শেখানো বুলির মতো আউড়ে গেলো অবিনাশ।

'না, এখন আমাকে ভাবতেও হবে না। চিরকাল আমিই ভেবে এসেছি—এখন আর তার দরকার নেই।' অদ্ভুত শোনালো শোভনার কণ্ঠস্বর, সেই শাদা, স্তব্ধ ঘরে, রোদের রেখা তার চাদরের উপর উঠে এসেছে। তৃপ্তিহীন, বিস্মৃতিহীন তৃষ্ণা যেন কণ্ঠনালী ছিঁড়ে কথা ক'য়ে উঠলো। শোভনা রোদের দিক থেকে মুখ ফেরালো; ঢিলে শেমিজের নিচে তার চোখা কাঁধ লুকোনো কোনো অস্ত্রের মুখের মতো।

* * *

নেকটাইয়ের ফাঁসটা গলায় পরাতে-পরাতে অবিনাশ টেবিলে এসে বসলো। —'কই, দাও।'

সন্ধ্যামণি বললে, 'কালকের শার্টটাই পরেছ কেন? নতুন একটা বের ক'রে নিলেই পারতে।'

'ওঃ, ওতেই হবে, ওতেই হবে। দাও এখন।'

'দু-মিনিট আগে এলে কী দোষ?'

অবিনাশ এক চামচে স্যুপ খেয়ে বলতে আরম্ভ করলো: 'Adequate mastication keeps away—'

'থাক, থাক, ও অনেকবার শুনেছি। সেই জন্যেই অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে খাও বুঝি?'

অবিনাশ কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত মাখলো।—'ভালো ক'রে চিবোবার কখনো সময় হয়নি, অন্যান্য জিনিশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। জল।'

সন্ধ্যামণি কাচের কুঁজোটা এগিয়ে দিলে।

'তুমি কখন খাও?'

'এই তো এক্ষুনি খাবো।'

'তাহ'লে একটুখানি আগে খেলেও তো পারো। সঙ্গে কেউ খেলে আস্তে-আস্তে খাওয়া হয়। ছেলেবেলায় আমাকে একা-একা খেতে হ'তো, সেইজন্যেই তো—'

'মাংস কি খাবে এ-বেলা ?'

'মাংস ? সর্বনাশ !'

'আধুনিকতম চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে রাঁধা হয়েছে—'

অবিনাশ থালা থেকে মুখ তুলে তাকালো। সন্ধ্যামণির মুখে শ্রমের মলিনতা। উশকোখুশকো চুল। টেবিলের উপর এক হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে। আঙুলে মশলার হলদে দাগ।

'শোনো,—' অবিনাশ হঠাৎ ব'লে উঠলো।

'কী বলছিলে ?'

কিন্তু বলা হ'লো না, বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, এখন সময় নেই। 'আর-এক টুকরো নেবু দাও।'

'কী বলছিলে ?' সন্ধ্যামণি জিগেস করলে।

অবিনাশ একটা আধা-সেদ্ধ বীন মুখে ভ'রে দিলে।—'এত কখন খাবো ?'

'যা পারো খাও।'

তবু বলা হ'লো না। সন্ধ্যামণির মুখের এই ছায়া তার ভালো লাগে না। এ-দম্ভ তার কোথা থেকে এলো যে এখানকার জীবনের অভ্যস্ত আয়োজনের এতটুকু অংশও সে ছেড়ে দেবে না ? অভ্যেস অনুসারে সব পাওয়া যাচ্ছে এটা অবশ্য মন্দ লাগে না; কিন্তু মাঝে-মাঝে বদল হ'লেও বেশ ভালোই লাগে। যাকে অসুবিধে বলি, তাতে কোনো রস নেই, সন্ধ্যামণিকে এ-কথা কে শেখালে ?

'তোমার বৌদিকে আজ যেন একটু ভালোই দেখলুম।'

'হ্যাঁ, আজকাল মাঝে-মাঝে কথাবার্তা বলেন।'

'ওঁর ঘুমানো দরকার।'

'রাত্রে বেশ ঘুম হয় তো।'

'তাহ'লে তো ভালোই,' ব'লে অবিনাশ এক ঢোঁক জল খেলে। ঘুমোনো দরকার, ভুলে যাওয়া দরকার, ভুলে থাকা দরকার। যদি একবার ও ওর আত্ম-চেতনা থেকে মুক্তি পেতে পারতো—

'তোমার ?' অবিনাশ হঠাৎ জিগেস করলে।

'আমার—কী ?'

'তোমার ঘুম হয় তো ?'

'আমার আবার ঘুমের জন্য ভাবনা।'

'না কি আবার একজন নার্সকে খবর দেবো ?'

'দিতে পারো ইচ্ছে করলে।'

'বেশ, দেবো না তাহ'লে।'

'এ-সব নিয়ে ভাববার তোমার কী দরকার ? বরং একটু বেশি চিবিয়ে-চিবিয়ে ভাত খাও।' সন্ধ্যামণি হেসে উঠলো।

পাৎলা টলটলে জলের মতো হাসি। তাতে হঠাৎ তার ছেলেবেলাকার স্বর লাগলো যেন। যখন সে মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠতো, ঝেঁকে উঠতো তার চুল। এখনো, এখনো কোনো কথায়, হঠাৎ কোনো হাসিতে যেন সেই সময়কার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। হয়তো সত্যি তা নয়, হয়তো অবিনাশ ও-রকম ভাবে মাত্র। ছেলেবেলাকার সেই সন্ধ্যামণি তার মনে এমন স্পষ্ট

যে টেবিলের উপর এক হাত রেখে দাঁড়ানো এই মেয়েটিকে তার প্রায় আলাদা মানুষ ব'লে মনে হয়।

সে-সময়ে শোভনাও সন্ধ্যামণিকে ভালোবাসতো। সে যে তার 'শাশুড়ি'র সম্পর্কে তাদের কাছে এসেছে, এই সত্যটাও কেমন সহজে সে ক্ষমা করলে। তাদের শ্যামবাজারের সেই ফ্ল্যাটে কেবল দু-জন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্যে মাঝে-মাঝে যেন গুমোট নামতো। যা-ই বলো না, বৃহৎ সংসারের মধ্যে বাস করার একটা সার্থকতা আছে। কেবল একজনকে নিয়ে কি দিন কাটে! কেবল একজনের সঙ্গে একইরকমের সম্বন্ধের চাপে জীবন কেমন নিস্তেজ হ'য়ে আসে। নানারকম আত্মীয়তার ও সম্পর্কের, কর্তব্যের ও কৌতুকের বিচিত্র রং না লাগলে শেষ পর্যন্ত যেন ভালো লাগে না। বিশেষ ক'রে আমাদের হিন্দু মেয়েদের পক্ষে এ-কথা সত্যি: কেননা যে-বৈচিত্র্য ও বর্ণময়তা পুরুষরা সমস্ত বাইরের জগৎ থেকে সংগ্রহ করতে পারে, মেয়েদের হয় তা পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই নিতে হয়, নয় তা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। কলকাতায় প্রথম কয়েক মাসের মুক্তির আনন্দের পরে শোভনা ভিতরে-ভিতরে যেন হাঁপিয়ে উঠছিলো। নিজের বাড়িতে নিজে রাজত্ব করার উত্তেজনা একটু যখন ক'মে এলো তখন সে আবিষ্কার করলো, তার রাজ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকা থেকে-থেকে ধরা পড়ছে।

সেই হাঁপ-ধরা আবহাওয়ায় এলো সন্ধ্যামণি, বসন্তের একটুখানি হাওয়ার মতো। ওর বাবা কলকাতায় এসেছিলেন বদলি হ'য়ে। অবিনাশের পাড়াতেই বাড়ি নিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তাঁদের

প্রতি কটাক্ষ ক'রে শোভনা বলেছিলো, 'ভারি তো! একে আবার আত্মীয়তা বলে নাকি?' কিন্তু দেখা গেলো, আত্মীয়তার চেয়ে বড়ো জিনিশ আছে। সন্ধ্যামণি তার অবি-দাকে ভোলেনি, আর যে-বৌদির কাছে ঘেঁষতে সে বড়ো-একটা সাহস পায়নি, এবার সেই বৌদিই এলেন এগিয়ে। তাঁর হাত থেকে আস্ত চকোলেটের বাক্স উপহার পেয়ে সে তার অবি-দার কানে-কানে গিয়ে বলেছিলো—

সেই সন্ধ্যামণি! আজ তার দিকে তাকিয়ে কে সে-সব কথা বিশ্বাস করতে পারে! এমন নির্মমভাবে সময় কেটে যায়। আশ্চর্য কিছু নয়: তার নিজেরও তো আজ লোহা-রঙের চুল।

'ও কী? দই!'

ঢকঢক ক'রে জলের গেলাশ শেষ করতে-করতে অবিনাশ হঠাৎ থেমে গেলো—'আগে বলতে হয় না!'

দু-আঙুল দিয়ে শক্ত, শাদা দইটা সে একটু নাড়া-চাড়া করলে।

'অমন বিশ্রী চেহারা ক'রে থাকিস কেন?' মনের ভুলে এখনো তার মাঝে-মাঝে তুই বেড়িয়ে পড়ে।

'চেহারার কথা ভাববো এমন সময় কোথায়?'

'তোমরা আধুনিক মানুষ; সময় না-থাকার বাহাদুরিটা খুব শিখেছো।'

'ভালো লাগে না,' একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যামণি মৃদুস্বরে বললো।

'উঃ!' সন্ধ্যামণির কথার সুরে কী-একটা ছিলো, অবিনাশের

মনটা যেন জ্বালা ক'রে উঠলো। 'একজনের অসুখ ব'লে বাড়ি-সুদ্ধু সবাইকে ভূত সেজে ব'সে থাকতে হবে!'

কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে সন্ধ্যামণি একটু হাসলো।

'এ-সব সত্যি আমার ভালো লাগে না,' অবিনাশ আবার বললো। 'তুমি পেয়েছো কী? তুমি না-থাকলে আমরা সবাই ম'রে যেতাম, এ-কথাই খুব উচ্চস্বরে জানাতে চাও তো?'

'কী করবো বলো,' সন্ধ্যামণি গেলাশটায় আবার জল ভ'রে দিলে। 'বাহবা পেতে কার না ভালো লাগে?'

'বিশুদ্ধতম বাঙালি মতে খাওয়া হ'লো বটে!' অবিনাশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আওয়াজ ক'রে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো।

ছ-মিনিট পরে আবার নেমে এলো উপর থেকে। এত্তির একটা কোট, বগলে এক তাড়া বই। মুখের সিগারেটটা এখনো ধরানো হয়নি।

'মণি!'

খাবার টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে সন্ধ্যামণি চুপচাপ ব'সে, পাখার হাওয়ায় উড়ছে চুল। ভাবছে। আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজের-নিজের ভাবনা। এমন ভাবনা আছে অন্য লোকের সামনে যা ভাবাও যায় না।

চৌকাঠে অবিনাশ এসে দাঁড়ালো।—'কী করছো তুমি ওখানে ব'সে? নাইতে যাবে না?'

'ঐ কোটটাতে তোমাকে মোটেও ভালো দেখায় না, অবি-দা।'

'যা খুশি তা-ই করো! তোমার দেখাশোনা করবার জন্য এখন আর-একজন লোক কোথায় পাবো?'

সন্ধ্যামণি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পিঠের উপর চুলগুলো খুলে ফেললো।—'যাচ্ছি, যাচ্ছি।'

অবিনাশ বগলের বইগুলো সামলে সিগারেট ধরাতে গেলো, পারলো না। সন্ধ্যামণি হেসে উঠে বললে, 'মেজাজ খারাপ করলে ও-রকম হবেই। দাঁড়াও।'

গেলো কাছে, অবিনাশের হাত থেকে দেশলাই নিয়ে দু-হাতে আড়াল ক'রে ধরালো। তুলে ধরলো অবিনাশের মুখের কাছে। একটা ধোঁয়ার মেঘ সন্ধ্যামণির মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লো।

'একটু ভালো পোশাক পরলে কি দোষ হয় কোনো? লোকেই বা বলে কী?' সন্ধ্যামণি চাপড়ে-চাপড়ে কোটটা ঝাড়লো, নেকটাইয়ে দুটো-একটা টান দিলে। 'যাও এবার, যাও।'

দু-পা গিয়ে অবিনাশ আবার ফিরে এলো। 'মণি।'

সন্ধ্যামণির চুলের মধ্যে সক্রিয় আঙুলগুলো থেমে গেলো।

'রবীন্দ্রনাথের "রাজা" হচ্ছে আজ—যাবে?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি, তুমি। আমি একটা টিকিট নিয়েছি—'

'তুমি যাবে না?'

'তোমাকে জিগেস করছি—জবাব দাও কথার।'

'না, আমি যাবো না।'

'তুমি যাও না—শোভার কাছে আমি বসবো'খন।'

'হ্যাঁ, তাহ'লেই হয়েছে! কখন কী ওষুধ দিতে হবে—'

'সব পারবো, তুমি ব'লে দিয়ো। এই ক-মাস তুমি তো একদিনও বাড়ি থেকে বেরোওনি—'

'থাক, আমার জন্য ভাবতে হবে না।'

'না! তুমিই সবার জন্য ভাববে! যেখানকার যত ভাবনা সব তুমিই একচেটে ক'রে নিয়েছো! অন্য কারো পক্ষে এতটুকু ভাগ বসাতে যাওয়া অমার্জনীয় ট্রেসপাস।'

'হাই ট্রীজন! ফাঁসির কমে শাস্তির ব্যবস্থা নেই।'

'বেশ তাহ'লে!' অবিনাশের বাহুর একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গির সঙ্গে-সঙ্গে ঝুপ ক'রে বইগুলো সব মেঝের উপর ছড়িয়ে প'ড়ে গেলো। সন্ধ্যামণি নিচু হ'য়ে তুললো সেগুলো। 'চলো এগুলো গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

'থাক, থাক, দাও।'

একটু পরে বাইরে মোটরের স্টার্ট নেবার গর্জন শোনা গেলো। আঙুলের ডগায় একটু-একটু ক'রে তেল নিয়ে সন্ধ্যামণি ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে-করতে চুলে মাখাতে লাগলো। চিকচিক ক'রে উঠলো ঘন কালো চুল। একটা চুলের গোছা সামনের দিকে টেনে এনে আঙুলে জড়িয়ে সে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে। তারপর স্নানের ঘরের দিকে না-গিয়ে হঠাৎ ফিরে এসে বসলো সেই চেয়ারটায়। বেলা ব'য়ে গেলো।

* * *

ছোট্ট, লাল গাড়িটা ক্যাথিড্রেলের পাশের রাস্তা দিয়ে চৌরঙ্গিতে এসে পড়লো। পুলিশের হাত তোলা। এঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ করছে। অবিনাশ আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। গর্ব, গর্বের বিকৃতি। অন্যের জন্যে কী আমি করতে পারি, তা ত্যাখো। নিজের প্রতি কতটা উদাসীন হ'তে পারি, ত্যাখো একবার! ওকে আর প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ওর এ-সব বাড়াবাড়ি থামাতেই হবে—জোর ক'রে, যদি দরকার হয়। পুলিশের বাঁশি বাজলো, সে মিশে গেলো চৌরঙ্গির যান-স্রোতে। আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে—এ-সময়টায় এমন ভিড় নিতান্ত ধীরে-সুস্থে না-চ'লে উপায় নেই। ময়দান থেকে টাটকা হাওয়া তার মুখে এসে লাগছে। হয়তো তার মিনিট দুয়েক দেরি হ'য়ে যাবে। সত্যি, মণির সঙ্গে এক-এক সময় মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত। ও যে কোনো কথাতেই রাগে না, সবচেয়ে অসহ্য সেইটেই। আর ওকে কী-ই বা বলা যায়—ও, মণি, সন্ধ্যামণি—তাদের সেই হাঁপিয়ে-উঠা বাড়ির ভিতর দিয়ে বসন্তের হাওয়ার মতো যে ব'য়ে গিয়েছিলো! ভেঙে দিয়েছিলো গুমোট, আট বছরের সেই মেয়ে, তার হাসিতে, কথায়, কৌতুকে, কৌতূহলে, প্রগল্‌ভতায়। তার অজস্র খুশিতে, তার খামখেয়ালি আবদারে, তার দুর্বোধ্য, দুর্জয় অভিমানে। যেন সমস্ত জীবন অবিনাশের ঘরের মধ্যে লুটিয়ে

পড়েছিলো—জীবনের সমস্ত মধুরতা, প্রাণের স্নিগ্ধ সবুজে আভাময়। পাড়ার স্কুলে ওকে ভরতি ক'রে দেয়া হয়েছিলো: স্কুল থেকে প্রায়ই ও সোজা চ'লে আসতো তাদের বাড়িতে; আর ওকে খুশি করবার নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে প্রযুক্ত হ'তো অবিনাশের প্রথম শ্রেণীর মস্তিষ্কের সমস্ত ক্ষমতা। কী ভালো তার লাগতো ওকে পড়াতে, ওকে শেখাতে। স্কুলটা ছিলো অকথ্য বাজে: অবিনাশ তার নিজস্ব সব প্রণালী ভাবতো আর প্রয়োগ করতো ওর উপর। তার নিজের কাছেও এটা একটা মজার খেলা, জীবন্ত জিনিশ নিয়ে, মানুষের জীবন্ত মন নিয়ে এই পরীক্ষা। ওকে নিয়ে তার শহর বেড়ানো, চিড়িয়াখানা আর জাদুঘর দেখা, সন্ধ্যার পর ছাদে ব'সে তারা চেনানো। কী ভালোই লাগতো। আমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে ঠিক আমার নিজের মনের মতো ক'রে একজন মানুষ তৈরি করবো, এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাও বড়ো কম নয়। আর তার উদ্দীপনায় মাঝে-মাঝে হয়তো সে একটু অত্যাচারই ক'রে ফেলতো ওর উপর। তবু, মোটের উপর, ছাত্র হিশেবে ও ছিলো খুবই ভালো। সব সময় চলতো সঙ্গে-সঙ্গে, হয়তো একটু হাঁপাতে-হাঁপাতে, হয়তো বা একটুখানি পেছিয়েও পড়তো কখনো। কিন্তু সব জড়িয়ে খেলাটা যে সে অত্যন্ত উপভোগ করছে এটা সে বুঝতে দিতো প্রতি মুহূর্তে। অবিনাশের যেমন অপার, স্বতঃ-প্ররোচিত দাক্ষিণ্য, ওরও কৌতূহল তেমনি অপরিসীম।

ফল হ'লো আশ্চর্য। অবিনাশ নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে গেলো।

এমন কি, শোভনাও তা লক্ষ্য করলে। কোথায় যেন একটু নরম হ'য়ে গেছে তারও মন—যখন থেকে সন্ধ্যামণি তার বাড়ির একটা অংশ হ'য়ে গেছে। ঐ একবার, ঐ একবার মাত্র তার হার হয়েছিলো: তার সমস্ত বুদ্ধি আর বিবেচনা, তার প্রখর দৃষ্টি, তার ভবিষ্যৎ-নির্মাণের কঠিন সংকল্প—হার হ'লো সব-কিছুর ঐ শিশুর কাছে। হয়তো এমন মুহূর্ত তার জীবনেও এসেছে, যখন তার মনে হয়েছে কেবল টাকা আর জিনিশের সঞ্চয়ই সব নয়, তা ছাড়াও কিছু আছে। আছে কোনো অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে সন্ধ্যামণির লজ্জাহীন, সুন্দর খুশি হওয়া।

'মেয়েটার মাথা আছে,' একদিন সে বলেছিলো, 'লেখাপড়া শিখলে কিছু হ'তে পারবে।'

'বাঙালির ঘরের মেয়ে—কী আর হবে,' একটু বিনয় ক'রে বলেছিলো অবিনাশ।

'হওয়াতে যদি চাও, তাহ'লেই হয়,' শোভনা তার সহজ বুদ্ধির নিশ্চয়তার সুরে বলেছিলো। 'আমার শুধু একটা ভয় হয় যে পূর্ণেন্দুবাবু কেবলই হয়তো এখান থেকে ওখানে বদলি হবেন—মেয়েটার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। ওকে আমাদের কাছে রাখতে পারলে বেশ হ'তো।' শোভনার শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রম ছিলো, নিজে সে সেটা বেশি পায়নি। কিন্তু এও ঠিক যে সন্ধ্যামণির প্রতি অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ জন্মেছিলো তার মনে।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আবার থামতে হ'লো। পার্ক স্ট্রীট থেকে লম্বা গাড়ির স্রোত সোজা মেয়ো রোডে গিয়ে পড়ছে, কোনাকুনি

ড্যালহুসি স্কোয়ারের দিকে। অন্য দু-দিকে দেখতে-দেখতে গাড়ির মিছিল জ'মে উঠলো। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে, সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলো; পিছনে একটা গাড়ির অসহিষ্ণু হর্ন তার চমক ভাঙালো। মৃদু একটা ঝাঁকুনি; সে এগিয়ে গেলো। দিনগুলো গরম হ'য়ে উঠছে; আর এই নেকটাইয়ের ফাঁস তার অসহ্য লাগে। কাপড়চোপড় সম্বন্ধে চিরকাল সে উদাসীন; আর তাকে শোধরাবার কোনো সুযোগ সন্ধ্যামণি ছাড়ে না। ওর নিজের প্রকৃতিটা কিছু শৌখিন—ছেলেবেলা থেকেই। রঙের চোখ আছে ওর। রঙ আছে মনে। ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপসা গাছ-পালা, এপারেতে মেঘের মাথায় এক-শো মাণিক জ্বালা। এ-দুটো লাইন সুর ক'রে ব'লে-ব'লে ও ক্লান্ত হ'তো না কখনো। ওপারেতে বৃষ্টি এলো—

ছাইরঙের রাস্তার উপর রোদের বার্নিশ। বৃষ্টিহীন আকাশ ধুলোয় অস্পষ্ট। এই সময়ে মনে-মনে আওড়াতে ভালো: ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপসা গাছ-পালা। ক্ষীণ, ছেলেমানষি ওর কণ্ঠস্বর। কানের উপর দিয়ে টুপির মতো নেমে-আসা চুলের নিচে গম্ভীর ওর মুখ। ছেলেমানষি-গম্ভীর। বৃষ্টি আসছে ছুটে, নদীতে ঢেউ উঠলো, শব্দ শোনা যাচ্ছে। টুপির চুলের নিচে ওর গম্ভীর মুখ, মস্ত একটা পুতুল যেন। অবিনাশের প্রসাধনের খুঁত ও ধরছে তখন থেকেই।—কিন্তু ওর মুখ ঘামে কালো, শাড়িটা আধ-ময়লা, আঙুলে মশলার দাগ। আর নাটক দেখতে ও কিছুতেই যাবে না। শোভনার কাছে ও ব'সে থাকবে, নীল-আলো-জ্বালা সেই ঘরে।

ল্যাভেণ্ডারের ক্ষীণ গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়, ধোঁয়ার মতো। ও ব'সে থাকবে, আর শোভনা পাৎলা তন্দ্রার ভিতর থেকে থেকে-থেকে চমকে উঠবে। ব'সে-ব'সে টেম্পারেচারের চার্ট মেলাবে, লিখে রাখবে ডাক্তারের জন্য ছোটো-খাটো বিবরণ। টেবিলের উপর নানারঙের শিশি-বোতল, ছোটো একটি সেনানী, মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধের সাহসী সৈন্যদল। ম্লান-নীল আলোয় মৃত্যুময় ঘর। মৃত্যুর চাপা নিশ্বাস, মৃত্যুর অদৃশ্য ছায়া দেয়ালে। তারই মধ্যে সন্ধ্যামণি ব'সে, প্রাণের একটা ফোয়ারা, মৃত্যুর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ। দু-হাতের মুঠির মধ্যে কৃতজ্ঞতার স্তূপ : ওর আত্ম-দানের উপার্জন।

এ-সব আমার ভালো লাগে না, মনে-মনে সে বললে। এই আত্ম-বিসর্জনের ঝোঁক। মনের একটা বিকৃতি, তা ছাড়া আর কী? শ্বেত, নীরক্ত তার মূর্তি; আত্ম-বিনাশী। অন্যের সুখ-বিধান করছি তার চাইতে নিজেকে যে নষ্ট করছি, সেই তৃপ্তিই বড়ো। ঝোঁকটা আসলে ধ্বংসের। বিষের মতো লাগে অবিনাশের ভাবতে। তবু। তবু এ-ও তো ঠিক যে সন্ধ্যামণি না-থাকলে—কী হ'তো? কিছু-একটা হ'তোই। কিন্তু এই ক-মাস ধ'রে সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর চাপিয়ে রেখে ও এমন অবস্থা করেছে যে এখন মনে হচ্ছে ও না থাকলে কিছুতেই চলতো না। আমার উপর সবাই নির্ভর করছে, এ-কথা ভাবতে পারার আনন্দ কিছু কম নয়। নিজেকে এমন বড়ো মনে হয়, এত উঁচুতে।

প্রথমে যদি ও না আসতো তাহ'লেই হ'তো। কেউ ওকে বলেনি। সে কখনো ভাবতে পারতো না কারো উপর ও-রকম

দাবী করা যায়। কিন্তু ও নিজেই একদিন হস্টেল থেকে চ'লে এলো। যখন বোঝা গেলো শোভনার অসুখটা সহজ নয়, তখন থেকে ও রোজ একবার ক'রে আসে। 'রোজই কেন আসো?' সে আপত্তি জানিয়েছিলো।

'কেন, দোষ কী?'

'সময় নষ্ট হয়।'

'ওঃ! আমার সময়। কত সব মহৎ কাজ করছি সময় নিয়ে।'

'কিন্তু তোমার যদি ঠিক ইচ্ছে না করে, আসবার দরকার নেই।'

'আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তুমি সবই জেনে নিয়েছো?'

'এই অসুখের বাড়ি!' তবু অবিনাশ বলেছিলো।

'কেন, ছোঁয়াচের ভয়?'

'না, না, তা হবে কেন?' তার প্রতিবাদে একটু অনাবশ্যক জোর। 'অসুখের বাড়িতে কি ভালো লাগে খুব?'

'ভালো লাগাটাই একমাত্র কথা নাকি?'

'কী তবে?'

'তুমি তা বুঝবে না।'

অসুখটা বেশ জেঁকে বসলো। অবিনাশ তার বাবাকে চিঠি লিখলো, বিশেষ-কিছু লিখলো না। সতীশবাবু তখন পেন্সন নিয়ে দেওঘরে বাড়ি ক'রে আছেন। তিনি লিখলেন দরকার হ'লে তিনি এসে থাকতে পারেন সস্ত্রীক। অবিনাশ লিখলো দরকার নেই। নিজের শান্তি নষ্ট হচ্ছে ব'লে অন্যের শান্তি সে নষ্ট করতে যাবে কোন্ স্পর্ধায়? একদা তো সে বাবার সমস্ত জীবন কেড়ে

নিয়েছিলো, আর নয়। এখন এই শেষের দিনগুলো হোক তাঁর নিজের।

এসপ্লানেডের যানবহুলতা কোনোরকমে পার হ'য়ে গাড়ি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে ঢুকলো। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তা পেয়ে সে গতি একটু বাড়িয়ে দিলে। ঝেঁকে উঠলো ছোটো, পাৎলা গাড়ি। একদিন তাকে ভালো একটা গাড়ি কিনতেই হবে। সন্ধ্যামণির কাছে সে প্রতিশ্রুত। 'নিজের প্রতি আরো একটু ভালো ব্যবহার তোমার করা উচিত,' প্রায়ই সে বলতো। কিন্তু সত্যি, এ-সব দিয়ে তার দরকার নেই; সে বেরোয়ই বা কতটুকু। শুধু, কোনো ছুটির দিনে, সন্ধ্যামণিকে নিয়ে শহরের বাইরে কোথাও হয়তো যেতো; চল্লিশ মাইলের চাপে গাড়ির দুর্বল শরীর থরথর ক'রে কাঁপতো। ওর চোখ বড়ো আর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো, গালে লাগতো লাল রং। আর ওর চোখের, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভালো লাগতো।

অনেকদিন ওর সঙ্গে সে বেরোয় না। এই ক-মাস ও একদিনও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। সে অনেক সহ্য করেছে; এইবার, একবার তাকে কঠোর হ'তে হবে। সেদিন হঠাৎ ও এলো, সঙ্গে একটা স্যুটকেস। মুহূর্তে ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে।

'তোমাকে কে আসতে বলেছিলো?'

'তোমার অনুমতি চাইলে তো আর দিতে না, সুতরাং না-ব'লেই আসতে হ'লো।'

'এখানেই থাকবে এখন ?'

'তাই মনে ক'রেই তো এসেছি। আমি কি তোমাদের কোনো কাজেই লাগবো না ?'

'কতদিন থাকবে ?'

'তা এখন কী ক'রে বলি ?'

'তোমার বোর্ডিং একেবারে ছেড়ে এলে ?'

'যখন খুশি ফিরে যেতে পারি।'

'তোমার পড়াশুনো ? পরীক্ষা ?'

'কী হবে পড়াশুনো ক'রে ? কী হবে এম. এ. পাশ ক'রে ?'

'হাজার পাশ করলেও যে তোমার কিছু হবে না তা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিলো।'

অবিনাশের মনটা যেখানে কাঁচা, ঘা লেগেছিলো সেখানেই। সন্ধ্যামণিকে সে তৈরি করেছে, ও ঈশ্বরের আর তার সম্মিলিত সৃষ্টি, এমনি একটা গর্ব ছিলো তার মনে। সেই গর্ব আহত হ'লো ওর কথায়, ওর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। তাকে ও অস্বীকার করলে, সত্যি বলতে। এমন হয়েছিলো যে ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করবার ভার পড়েছিলো তারই উপর। শোভনা যা ভয় করেছিলো— পূর্ণেন্দুবাবু আবার বদলি হলেন। শোভনা তখন সত্যি-সত্যি বললে, 'সন্ধ্যাকে রেখে দাও আমাদের কাছে।' আশ্চর্য, শোভনা যে এমন অনাবশ্যক একটা দায় গায়ে প'ড়ে নিতে চেয়েছিলো। যখন সে পেয়েছে তার স্বামীকে সম্পূর্ণ ক'রে, তার

স্বগৃহের নীরন্ধ্র রাজত্ব, তখন তার মন হয়তো ছড়াতে চাইছিলো কোনো নতুন দিকে। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় যখন নেই, অন্যের প্রতি অকৃপণ হওয়া তখন সহজ হয়। আর এটাও অবিশ্যি ঠিক যে শোভনা সন্ধ্যামণিকে মনে-মনে একটু ভালোবেসেছিলো।

সন্ধ্যামণি তাদের সঙ্গে থেকে গেলো; খুব সহজেই সেটা হ'লো, মা-বাবাকে ছাড়তে যতটা কষ্ট ওর হ'তে পারতো, তা হ'লো না। ওরা অনেক ভাই-বোন; মস্ত পরিবারের গোলেমালে মা-বাবাকে ওরা ঠিক খুঁজে পেতো না। আর পূর্ণেন্দুবাবুও এই মেয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবিত হচ্ছিলেন; বয়স অত অল্প না-হ'লে বোর্ডিঙেই রাখতেন হয়তো। ঠিক সেই সময়ে, অবিনাশের বাড়ির চেয়ে ভালো তিনি কিছু ভাবতে পারতেন না। সবদিক থেকে এমন একটা মাপসই ব্যবস্থা পৃথিবীতে বড়ো-একটা হয় না। ও থেকে গেলো; পাড়ার স্কুল থেকে বড়ো স্কুলে জাতে উঠলো। কিন্তু ওর আসল শিক্ষা চললো অবিনাশেরই হাতে। তার শিক্ষকতা ওর পক্ষে এক-এক সময় হয়তো জুলুম হ'য়ে উঠতো; কিন্তু এটা বলবার আছে যে ছাত্রকে সে যদি-বা মাঝে-মাঝে রেয়াৎ করতো, নিজেকে কখনোই নয়। এই ছোট্ট মানুষকে নিজের মনের মতো ক'রে তুলতে গিয়ে সে দেখলো অনেক বিষয়ে সে নিজেই নিজের মনের মতো নয়। সে-ক্ষতিপূরণের চেষ্টায় অনেক সময় তার গেছে। আর দিনের পর দিন, অলক্ষিতে, সেই চীনেমাটির পুতুল বেড়ে উঠতে লাগলো; তার নিজের হাতের পুতুল। কিন্তু পুতুলের চেয়ে কিছু

বেশি যেন, কিছুদিন পর এমনি মনে হ'তে লাগলো। নানা রকম ভাবনায় আর কল্পনায় আর অনুভূতিতে মিলিয়ে প্রাণের একটি উপনিবেশ। রামধনু-আঁকা আকাশের টুকরো, ক্ষণে-ক্ষণে তার রং বদলাচ্ছে।

আর-কিছু নেই, ভাগ্যের কাছে আর-কিছু যেন চাইবার নেই। জীবনের যা-কিছু দেবার ছিলো, সে দিয়েছে। এখন শুধু শান্তিতে দিন কাটিয়ে যাওয়া: জীবনের ছোটো-ছোটো রঙিন টুকরো নিয়ে বার-বার নানা রকম ক'রে সাজানো—শিশুর খেলার মতো। অবিনাশের মনে হ'তে আরম্ভ করেছিলো এই জীবন তার চিরন্তন। উচ্চাশার ব্যাধি তার ছিলো না। যেটা বাইরের রূপ সেখানে বেশি কিছু সে চায় না; অল্প পেলেই খুশি। আর ভিতরের দিকে—সে কি ছিলো সুখী? কিন্তু আধুনিক মানুষের বেশির ভাগ দুঃখের কারণই তো তীব্র আত্ম-সচেতনতা; আত্ম-জ্ঞানের ভয়ংকর চাপে সংকুচিত, রুদ্ধশ্বাস জীবন। যদি প্রতি মুহূর্তে জানবার আর বোঝবার ইচ্ছা থেকে আমরা মুক্তি পেতুম, মুক্তি পেতুম নিজের ভিতরটাকে বাইরে উল্‌টিয়ে এনে দেখবার অভ্যেস থেকে—যদি আমরা মেনে নিতে পারতুম, হ'তে দিতে পারতুম!

'আমার চাকরি থেকে ছুটি নেবার সময় হ'য়ে আসছে। পরে হয়তো আর পারবো না, আমার ইচ্ছা এই সময়ে তুমি ইওরোপে যাও। বিলেতের ডিগ্রি—'

সামনে একটা লোক সাইকেলে চ'ড়ে রাস্তা পার হচ্ছে, সে

ব্রেক ক'ষে দিলে। লোকটা নিশ্চিন্ত মনে শিষ দিতে-দিতে বাঁ দিকে ঘুরে গেলো; তার কপালের উপর বাদামের মতো একটা আঁচিল। সুতরাং বিলেতের ডিগ্রি তাকে আনতেই হবে। এই শেষ ক-বছরে বাবা তার জন্য যা করতে পারেন করবেন। এমন ভালো বাপ! আর তাঁর এই অসাময়িক বিবাহ। পাছে ছেলে কিছু মনে করে। পাছে কেউ কিছু মনে করে। ছেলেকে সব রকম সুযোগ তিনি দেবেন। আর তাই:

There was a young man called Fraser
Who once cut his throat with a razor.
When he asked, 'Am I dead?'
'No, you are not,' they said,
And made him a distinguished Professor

এই তো, এই তো। ভালোই। যে-হেতু তার বাবা মফস্বলের অন্ধকারে ব'সে-ব'সে দিনের পর দিন রায় লিখে গিয়ে-ছিলেন, সেইজন্যই সে আজ কুড়ি বারের বার হ্যামলেট পড়তে পারছে, দেরি করতে পারছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে, চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকতে পারছে। সময়ের অভাবে তাকে ছটফট করতে হয় না। এটা তার দরকার ছিলো: তার মস্তিষ্ক উঁচু দরের। কিন্তু এমন আরো অনেকে হয়তো আছে যাদের খুলির ভিতরকার জিনিশটা তারই মতো: ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর তারা নয়। আর-

কিছুর কমতি তাদের ছিলো না: অভাব ছিলো যেমন-হওয়া-উচিত-ছিলো বাপের।

সত্যি, এমন ভালো বাপ আর কারো হয় না। দেশে ফেরার জন্যে একবারও তাড়া করেননি। চোখ মেলে তাকিয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, আটলান্টিকের দুই পার, সমস্ত শাদা মানুষের জগৎ। ঘুরে বেড়িয়েছে, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছে। চার বছর। আর সে যখন ফিরে এলো, সন্ধ্যামণির বয়েস ষোলো। দস্তুরমতো ভদ্রমহিলা। স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো অবিনাশ। এতদিন মস্ত পৃথিবীর অনেক-কিছু দেখে সে অবাক হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় এখানে। দেখে-দেখে বিশ্বাস হয় না। যে-মেয়েকে নেহাৎ ছেলেমানুষ দেখে গেছি, তাকে হঠাৎ একদিন ষোলো বছরের দেখতে পাওয়া: এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বিস্ময়। পরিবর্তন নয়, রূপান্তর। সেই চীনেমাটির পুতুল ভেঙে এমন অপরূপ প্রতিমা তৈরি করলে কে?

গাড়ি কলুটোলার গলিতে ঢুকলো।

২

দীর্ঘ, দীর্ঘ দুপুর। রোদে-ঝলসানো আকাশ, মাঝে-মাঝে ফিকে শাদা মেঘ জড়ানো। দূরে নারকেল গাছগুলোর মাথায়-মাথায় শোঁ-শোঁ শব্দ। তা ছাড়া সব চুপ। গ্রীষ্মের দুপুরবেলার অদ্ভুত নীরবতা, মূর্ছার মতো। দুটো থেকে তিনটের মধ্যে একটা সময় আসে যখন সৃষ্টি মুছে যায়, সময় থেমে যায়। চারিদিকে সব চুপ : মানুষের ইচ্ছার আর আশার, সংকল্পের আর ব্যর্থতার জগতের উপর নেমে এসেছে একটা রৌদ্রময় মূর্ছার যবনিকা। এই সময়ে কারো-কারো হয়তো ঘুম ভেঙে যায়; সে চোখ মেলে, পাশে প'ড়ে-থাকা বইয়ের মলাটের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে একটু তাকিয়ে থাকে, আবার চোখ বোজে।

জানলার ধারে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে সন্ধ্যামণির চোখ ঘুমে ভ'রে আসছিলো। রোগীর ঘরের জানলা বন্ধ করা বারণ; বাইরের হু-হু হাওয়া নরকের গরম ঝাপটার মতো মাঝে-মাঝে গায়ে এসে লাগছে। বাতাসটা শুকনো, কর্কশ। কেমন ঝোড়ো, খ্যাপাটে গোছের। একটা অফুরন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো হু-হু ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে এই বন্ধ্যা নীরবতার উপর দিয়ে।

সন্ধ্যামণির হাতে ছিলো বই, কিন্তু কয়েক লাইনের বেশি পড়া হয়নি। মনটা কিছুতেই এগোতে চায় না। মন কিছু নিতে চায় না,

কিছু ভাবতে চায় না। শুধু তাকিয়ে থাকবে পাৎলা আঁশ-জড়ানো আকাশের দিকে। গাছের আওয়াজে কেমন ক্লান্তি। চোখ বুজে আসে। ঘুমোতে ইচ্ছে করে। ঠিক ঘুম নয়: একটা মনোহীন অস্পষ্টতা। মাঝে-মাঝে খুলছে চোখ, শোভনার দিকে তাকাচ্ছে। তার শরীর স্তব্ধ, মুখ দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। তাকে মনে হয় যেন গভীর শান্তিতে মুছে-যাওয়া। ছোটো, শিটোনো, শাদা তার শরীর—লুপ্তির কুয়াশায় ঝাপসা যেন। ঘুমে ঝাপসা সব। আবার চোখ বুজে আসে।

—'সন্ধ্যা।'

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, কিন্তু সন্ধ্যামণি চমকে উঠে বসলো।—'কী, বৌদি?'

শোভনা পাশ ফিরেছে, তার একটা হাত সোজা সামনের দিকে বাড়ানো, নিশ্চল। দু-আঙুল দিয়ে চাদরটাকে একটুখানি আঁকড়ে ধরেছে। স্পষ্ট-বিস্ফারিত চোখে ঘুমের ছায়া নেই।

'ক-টা বাজলো, সন্ধ্যা?'

'দুটো কুড়ি-মিনিট। এখন একটু আঙুরের রস খাবে?'

শোভনার শুকনো, বিবর্ণ ঠোঁট অল্প একটু বেঁকে গেলো।

'শোন।'

সন্ধ্যামণি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লো।

'একটা আয়না দে তো।'

'আঙুরের রস একটু খাও না, তিনটের সময় তো আবার সেই ওষুধ—'

'শুনতে পাসনি আমার কথা? একটা আয়না—'.

সন্ধ্যামণি চুপ ক'রে রইলো।

'কী, হ'লো কী তোর?' দুর্বল, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চড়তে গিয়ে কেঁপে উঠলো।

সন্ধ্যামণি উঠে দাঁড়ালো। 'দিচ্ছি।' রোগী যেন কোনো বিষয়ে কখনো উত্তেজিত না হয়। প্রশ্রয় দিতে হবে তার মরজিকে। হয়তো বর্তমানে নিজের মুখ দেখে কোনো উল্টো রকমের সুখ পাবে সে।

পাশের ঘর থেকে এনে দিলে রুপোয় বাঁধানো ডিমের আকৃতির আয়না। সেটা মুখের সামনে রেখে শোভনা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলে। তারপর এক পাশে সরিয়ে চুপ ক'রে রইলো। সন্ধ্যামণি আস্তে আয়নাটা তুলে নিলে; সেটা রেখে এলো পাশের ঘরে ফিরিয়ে।

এককালে শোভনার খাটের উল্টো দিকের দেয়ালে লম্বা একটা আয়না খাটানো ছিলো, তার নিজের আয়না, বাপের বাড়ি থেকে আনা। অসুখের খুব খারাপ অবস্থায় সে দু-দিন অচৈতন্য হ'য়ে ছিলো; সেই সময়ে সন্ধ্যামণি সেটা ঘর থেকে সরিয়েছিলো। জ্ঞান যখন ফিরে এলো শোভনা সেটা লক্ষ্য করলে।

'সন্ধ্যা, আয়নাটা কী হ'লো?'

'অবি-দা সেটা তাঁর ঘরে নিয়ে রেখেছেন।'

কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়েই সন্ধ্যামণি বুঝতে পেরেছিলো কথাটা সে বিশ্বাস করেনি। আয়নাটা আসলে কার্ডবোর্ড এবং

কাগজ মোড়া হ'য়ে প'ড়ে আছে বড়ো একটা কাঠের বাক্সে। বাড়িতে আয়নার ছড়াছড়ি: শোভনার অন্যতম সঞ্চয়। কিন্তু অবিনাশ ছিলো দর্পণে অনাসক্ত: তার আত্ম-দর্শনের পদ্ধতিটা অন্যরকম।

শোভনা তার রক্তহীন, শুকনো একখানা হাত চোখের সামনে মেলে নিশ্চল চোখে তাকিয়ে ছিলো। কিছু বলেনি: সবই বলেছিলো।

'সন্ধ্যা,' শোভনা ডাকলে।

সন্ধ্যামণি খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'বোস এখানে।'

'তোমার আঙুলের নখগুলো কী-রকম বড়ো হয়েছে, দাঁড়াও।' টেবিলের দেরাজ টেনে শুশ্রূষার নানারকম যন্ত্রপাতির ভিতর থেকে ছোটো কাঁচি বের ক'রে আনলে। 'দেখি।'

শোভনা তার হাত সমর্পণ করলো। এমন পাৎলা হাত, তুলে ধরলে মনে হয় তার ভিতর দিয়ে দেখা যাবে। খশখশে, কুঁকড়ে-যাওয়া চামড়া। নখগুলো চৌকো হ'য়ে বেড়ে উঠেছে, হলদেটে রং: কাঁচি বসাবার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলো, যেন কেউ আলগা ক'রে বসিয়ে রেখেছিলো।

'তোমার নখগুলো চমৎকার কাটে।'

শোভনা আধ-বোজা চোখে সন্ধ্যামণির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখ পর্যন্ত শাদা। যখন সে দ্রুত চোখ ফেরায়, হঠাৎ যেন মনে হয় শাদাটা বেরিয়ে গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়বে।

'সন্ধ্যা।'

'শুনতে পাসনি আমার কথা? একটা আয়না—',

সন্ধ্যামণি চুপ ক'রে রইলো।

'কী, হ'লো কী তোর?' দুর্বল, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর চড়তে গিয়ে কেঁপে উঠলো।

সন্ধ্যামণি উঠে দাঁড়ালো। 'দিচ্ছি।' রোগী যেন কোনো বিষয়ে কখনো উত্তেজিত না হয়। প্রশ্রয় দিতে হবে তার মরজিকে। হয়তো বর্তমানে নিজের মুখ দেখে কোনো উল্টো রকমের সুখ পাবে সে।

পাশের ঘর থেকে এনে দিলে রুপোয় বাঁধানো ডিমের আকৃতির আয়না। সেটা মুখের সামনে রেখে শোভনা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলে। তারপর এক পাশে সরিয়ে চুপ ক'রে রইলো। সন্ধ্যামণি আস্তে আয়নাটা তুলে নিলে; সেটা রেখে এলো পাশের ঘরে ফিরিয়ে।

এককালে শোভনার খাটের উল্টো দিকের দেয়ালে লম্বা একটা আয়না খাটানো ছিলো, তার নিজের আয়না, বাপের বাড়ি থেকে আনা। অসুখের খুব খারাপ অবস্থায় সে দু-দিন অচৈতন্য হ'য়ে ছিলো; সেই সময়ে সন্ধ্যামণি সেটা ঘর থেকে সরিয়েছিলো। জ্ঞান যখন ফিরে এলো শোভনা সেটা লক্ষ্য করলে।

'সন্ধ্যা, আয়নাটা কী হ'লো?'

'অবি-দা সেটা তাঁর ঘরে নিয়ে রেখেছেন।'

কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়েই সন্ধ্যামণি বুঝতে পেরেছিলো কথাটা সে বিশ্বাস করেনি। আয়নাটা আসলে কার্ডবোর্ড এবং

কাগজ মোড়া হ'য়ে প'ড়ে আছে বড়ো একটা কাঠের বাক্সে। বাড়িতে আয়নার ছড়াছড়ি: শোভনার অন্যতম সঞ্চয়। কিন্তু অবিনাশ ছিলো দর্পণে অনাসক্ত: তার আত্ম-দর্শনের পদ্ধতিটা অন্যরকম।

শোভনা তার রক্তহীন, শুকনো একখানা হাত চোখের সামনে মেলে নিশ্চল চোখে তাকিয়ে ছিলো। কিছু বলেনি: সবই বলেছিলো।

'সন্ধ্যা,' শোভনা ডাকলে।

সন্ধ্যামণি খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'বোস এখানে।'

'তোমার আঙুলের নখগুলো কী-রকম বড়ো হয়েছে, দাঁড়াও।' টেবিলের দেরাজ টেনে শুশ্রূষার নানারকম যন্ত্রপাতির ভিতর থেকে ছোটো কাঁচি বের ক'রে আনলে। 'দেখি।'

শোভনা তার হাত সমর্পণ করলো। এমন পাৎলা হাত, তুলে ধরলে মনে হয় তার ভিতর দিয়ে দেখা যাবে। খশখশে, কুঁকড়ে-যাওয়া চামড়া। নখগুলো চৌকো হ'য়ে বেড়ে উঠেছে, হলদেটে রং: কাঁচি বসাবার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এলো, যেন কেউ আলগা ক'রে বসিয়ে রেখেছিলো।

'তোমার নখগুলো চমৎকার কাটে।'

শোভনা আধ-বোজা চোখে সন্ধ্যামণির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখ পর্যন্ত শাদা। যখন সে দ্রুত চোখ ফেরায়, হঠাৎ যেন মনে হয় শাদাটা বেরিয়ে গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়বে।

'সন্ধ্যা।'

সন্ধ্যামণি নিচু হ'য়ে একটা নখের ভাঙা কোণ সন্তর্পণে তুলেছিলো, চোখ তুলে তাকালো।

'অনেক কষ্ট দিলাম তোকে।'

'তুমি যা কষ্ট পাচ্ছো তার তুলনায় কিছু নয়।'

'কত ক্ষতি হ'লো তোর—তোর পরীক্ষা—'

'মনে একটা ঘোরতর অশান্তি ছিলো, সেটা দূর হ'লো। বাঁচলাম। বেশি কথা বোলো না, বৌদি।'

শোভনা একটু চুপ ক'রে রইলো।

'এখনো তো সময় আছে : এ-বছরই দিয়ে দে।'

'তা আর ভাবনা কী? দিলেই হয়। দেখি ও-হাত।'

'কত আর সময় তুই নষ্ট করবি? এখন যদি আমার সেরে ওঠবার হয় তো সেরে উঠবোই। নার্স-দিয়েও কাজ চলতে পারে।'

'তা পারে।'

শোভনা প্রায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো।

'তোর অবি-দার জন্যে ভাবছিস?'

'তাঁর জন্যে ভাবনা আছে বইকি।'

'তাই ব'লে এমনি ক'রে আর কতকাল কাটাবি তুই?'

'সে তো ভাববার কথাই। দাঁড়াও, আর একটু।' আঙুলগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে কাঁচির উল্টো পিঠ দিয়ে নখ মেজে দিলে। 'নাও। ঘুমিয়েছিলে?'

'কত আর ঘুমোবো?'

'একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো না। পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো?'

'না, না, একটু কথা বলতে দে। সন্ধ্যা, তুই কী ভাবছিস ?'

'কী ভাবছি ?'

'তোর—কী মনে হয় ? তোকে এখানে ধ'রে রাখা—'

'ধ'রে তো কেউ রাখছে না, বৌদি।'

'তবু—মনে-মনে হয়তো তুই—'

'মনের মধ্যে কী আছে কে জানে ?'

'তোর যদি মন না চায়, তুই লজ্জা করিসনে।'

'লজ্জার দায় যদি এটা হয়, তা তো কাটিয়ে উঠতেই হবে।'

চুপচাপ কাটলো খানিকক্ষণ।

'সন্ধ্যা, সত্যি ক'রে একটা কথা বল। আমি কি বাঁচবো না ?'

'এই তো! এইজন্যেই তো তোমায় কথা বলতে দিতে নেই।'

'না, না, বল না। তোর কী মনে হয় ?'

'তুমি তো সেরেই উঠছো।'

'বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে।'

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হ'লো।'

সন্ধ্যামণি উঠে টেবিলের ধারে গেলো। বেলোয়ারি পসরা থেকে একটা শিশি বেছে নিয়ে ঢাললে।

'হাঁ করো।'

শোভনার নীরস, শাদা জিহ্বার উপর আস্তে ঢেলে দিলে। তার মুখ থেকে খারাপ গন্ধের একটা ঝটকা এসে লাগলো।

'এবার একটু ঘুমোবে ?'

কথা না-ব'লে শোভনা চোখ বুজলো।

'আমি একটু যাচ্ছি। যশোদাকে বসিয়ে রাখবো দরজায়, দরকার হ'লে ডেকো।'

সন্ধ্যামণি বেরিয়ে এলো। দোতলার কোণে ছোটো ঘর: একটা লোহার খাট আর আয়না-বসানো টেবিল দিয়ে অবিনাশ তার জন্য ঠিক ক'রে দিয়েছিলো। কিন্তু ঘরটার বেশি ব্যবহার নেই তার পক্ষে। রাত্রে শুতে আসে, তাও সব সময় নয়। অনেক রাত তার কাটে শোভনার ঘরে, মেঝেতে বিছানা পেতে। কি জানলার ধারের সেই ইজি-চেয়ারটায় ব'সে—সেটাই তার বেশি ভালো লাগে। খানিক ঘুমোয়, হঠাৎ জেগে ওঠে; মৃদু নীল আলোয় সমস্ত ঘরটা কেমন অদ্ভুত স্বপ্নের মতো ঠেকে। বিছানায় শুয়ে একটানা কয়েক ঘণ্টার ঘুমই যে সবচেয়ে ভালো, এই একটা মোহ থেকে অন্তত সে মুক্তি পেয়েছে।

ঘরে ঢুকলো, মেঝেতে একটা পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। ভেবেছিলো শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বে, ঘুম এলো না। পশ্চিমে একটা জানলা, বাঁকা হ'য়ে রোদ এসে পড়েছে। ভাবলো উঠে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়: থাক গে। সারা শরীর শিথিল, শিথিল ক'রে দিয়ে চোখ বুজলো। না, সে কিছু ভাববে না। কিছু ভাববে না, কিছু বুঝতে চাইবে না, চুপ ক'রে থাকবে। চুপ ক'রে শুয়ে থাকবে, প্রত্যেক স্নায়ুতে শিথিল, সমস্ত শরীরে স্তব্ধ। হাত বাড়ালে সিমেন্টের ঠাণ্ডা স্পর্শ। আঙুলগুলো ছড়ালো, তারপর হাতটা উ'ল্টিয়ে ফেলে রাখলো মেঝের উপর। চমৎকার ঠাণ্ডা। নৌকোতে চলেছে টলটলে জলের উপর দিয়ে, তীরে গাছ

ফুলে-ভরা, জালি-কাটা ছায়া পড়েছে জলে। জল ছলছল, ছোটো ছোটো চিকচিকে মাছের খেলা। ঘুম আসে না তবু। কিন্তু ঘুমোবার চাইতে এই হয়তো ভালো; এই চুপ ক'রে থাকা, এই আবছায়া, চেতনার ঝাপসা সীমান্তরেখা।

চেতনার প্রান্তদেশ, সেখানে চলো। সেখানে ঘন অন্ধকার; ডুব দাও সেই অন্ধকারে। সেখানে হয়তো সত্যের দেখা পাবে। সেই অন্ধকারের বুক ফেটে সত্য জ্ব'লে উঠবে সূর্যের মতো, কোনো সংশয় থাকবে না। এখানে অনেক আলো, অনেক ছায়া। ভাবনায় আর দ্বিধায়, ব্যথায় আর কল্পনায় এলোমেলো। যদি সুতো ছাড়াতে যাও, সুতো কেবল বেড়েই চলবে। কেবলই জড়িয়ে যাবে জটিল হ'য়ে। এর মধ্যে সত্যকে তুমি চিনে নেবে কেমন ক'রে? এই নানা জিনিশের মিশোলে, এই ভাঙাচোরায়? অন্ধকার এক ও সম্পূর্ণ, প্রশ্নহীন, রন্ধ্রহীন; সেখানে নিজেকে ঢেলে দাও, মিশে যাও তার মধ্যে—আর তোমার রক্তে বেজে উঠবে সুর, চুপ ক'রে শোনো।

মনের মধ্যে কী আছে কে জানে? কী না থাকতে পারে, কী না লুকিয়ে থাকতে পারে সেই অন্ধকারে? বাইরের জীবনে প্রতি মুহূর্তে তাকে চাপা দিয়ে যাই। তাতে দোষ কী? স্পষ্ট ক'রে দেখবার সাহস যদি না থাকে, কী করবো? সত্যকে মুখোমুখি দেখতে গেলে হয়তো সইবে না, সমস্ত জীবনে আগুন ধ'রে যাবে।

কিন্তু লুকিয়ে রাখাও সহজ নয়। অন্ধকারে সূর্য জ্ব'লে ওঠে, শরীর স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে যেন, কী যে ঘটছে নিজেই ভালো ক'রে বুঝতে

পারিনে। আমি তো তা চাইনে, অন্ধকারের বুক-ফাটা সেই ভয়ংকর আলো : আমি চাই আড়াল, আমি চাই ছায়া। আমি স'রে দাঁড়াবো, আমি এড়িয়ে যাবো ; দু-হাত ভ'রে নিতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করো, আমি দুর্বল।

আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো : নিজের উত্তাপের চাপে ক্লান্ত দিন এই অস্ফুট গুঞ্জনে ভ'রে উঠলো। মনের মধ্যে কী আছে কে জানে ? কিন্তু আমি তো জানি। এখন, এই একা ঘরে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে কার কাছ থেকে সে লুকোবে, কেমন ক'রে লুকোবে ? কোথায় সে আশ্রয় নেবে, কে বাঁচাবে তাকে ? বেরিয়ে এসেছে ভীষণ, নামহীন রহস্য তারই ভিতর থেকে : ভয়ে সে কাঁপছে।

খানিক পরেই অবি-দা বাড়ি ফিরবেন : হঠাৎ যেন একটা শারীরিক ভয় তার বুকের ভিতর দিয়ে কেঁপে গেলো। চোখ বোজো, আরো নিবিড় ক'রে চোখ বোজো : নিজেকে মুছে ফেলো। যেখানে অতল স্তব্ধতার শান্তি, সেখানে ডুবে যাও। কিন্তু বুকের মধ্যে হাজার দানো একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠতে চাইছে। যদি সে বলতে পারতো, বাতাসে-বাতাসে যদি ছড়িয়ে দিতে পারতো সেই কথা—সমুদ্র থেকে অজানা সমুদ্রের ঢেউয়ে যদি তা উড়ে যেতো, রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেনিয়ে উঠতো তারার ঝরনার মতো—হয়তো সে ভেঙে যেতো সেই ব্যথায়, দু-টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে যেতো, তবু পেতো মুক্তি, নিজের ভিতরে এই অবরোধ, এই নিপীড়িত রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি।

চোখ মেলে তাকালো। জানলার বাইরে পশ্চিমের আকাশ আলোয় তুলে-ধরা আয়নার মতো চোখ-ঝলসানো। আড়-হ'য়ে-পড়া রোদ ঘরের ভিতরে এগিয়ে আসছে। বিকেলের দিকে এমনি সরু একটি রোদের রেখা, দোতলার সেই ঘরে। স্কুল থেকে ফিরে সেই জানলার ধারে সে দাঁড়াতো। বয়স যখন অল্প থাকে, প্রকৃতির আশ্চর্য রূপটাই চোখে পড়ে, তার ছোটো-খাটো উৎপাত গায়ে লাগে না। এই যে আমরা গরমে ছটফট করি, এ-ও আমাদের বড়ো বয়েসের আত্মচেতনার পাপের একটা ফল। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরবেলায় শিশু ছাদে ঘুরে বেড়ায়: সে তখনো এ-কথা বলতে শেখেনি, 'উঃ, কী গরম।' হয়তো বাড়ি ফিরে দেখেছে অবি-দা এখনো ফেরেননি; সেই জানলায় ব'সে আধেক ছায়া-ঢাকা গলিতে লোকের যাওয়া-আসা দেখা: অদ্ভুত একটা ছবি, থেমে থাকছে না, এগিয়ে যাচ্ছে, চলছে। তার মুখের উপর গরম রোদ, ছোটো হাত দিয়ে হয়তো চোখ আড়াল করা। রোদ তার খারাপ লাগতো না, রোদ যে খারাপ লাগবার সে-কথা তখন পর্যন্ত কেউ তাকে শেখায়নি।

খিদে পেতো: অবি-দা কেন আজ এত দেরি করছেন? ওঁর সঙ্গে ব'সে গল্প করতে-করতে না-খেলে মনেই হয় না খেলাম। বৌদি লুচি ভাজছেন, দেখে এসেছে। এত দেরি—হঠাৎ একটু দূরে, ঐ তো! ঝুপ ক'রে সে নামলো জানলা থেকে, লাফিয়ে পার হ'য়ে গেলো সিঁড়ি, ছুটে গিয়ে দরজার কাছেই অবিনাশকে গ্রেপ্তার করলে। দু-হাতে তার কাঁধ থেকে ঝুলতে-ঝুলতে:

'লুচি ভাজা হচ্ছে! লুচি!' ঐ সুখাদ্যের উপর তার নিজের

বিশেষ একটু দুর্বলতা ছিল। হিড়হিড় ক'রে টানতে-টানতে তাকে নিয়ে যেতো যেখানে শোভনা চারদিকে ছড়ানো চাঁয়ের বাসনের মধ্যে ব'সে। 'বৌদি, দাও।'

'দাঁড়া একটু, আলু-ভাজা হোক।'

'না, না, দাও, এমনি দাও, এক্ষুনি দাও।' অকারণ, অসংবরণীয় আনন্দে শূন্যে হাত তুলে তার নাচ।

'এই, করছিস কী?' বৌদির শাসন। 'একটা-কিছু ভাঙ্‌বি।'

হয়তো থেমে গেলো, একটু রুদ্ধশ্বাস, সারা মুখে ঘাম। তারপর অবি-দার পকেটে হাত ঢুকিয়ে:

'দেখি কী এনেছো আমার জন্য।' বেরিয়ে এলো হয়তো লম্বা একটা খাম। 'কী আছে এর মধ্যে?'

'কী আছে বল তো?'

'ছাই! কিচ্ছু নেই।'

'গ্যাখ না খুলে।'

ভিতরে, বিশেষ-কিছু নয়, কয়েকটা রঙিন পেন্সিল। কিন্তু সন্ধ্যামণি এমন মুগ্ধ হ'য়ে গেলো যে হঠাৎ কিছু বলতে পর্যন্ত পারলে না। সম্পূর্ণ জানে, তবু জিগেস করা, 'আমার জন্যে?'

'বাঃ, সুন্দর তো পেন্সিল,' বৌদির মন্তব্য।

'সুন্দর না?' এখন সন্ধ্যামণির ভেবে অবাক লাগে তার জন্য অবি-দা নিজেও কতকটা ছেলেমানুষ হ'য়ে যেতেন। 'ট্র্যামে একটা লোক বেচতে এসেছিলো। ছ-আনা চেয়েছিলো, চার আনায় কিনলাম।'

কিন্তু অবি-দার গর্বের সুর বুঝি টেঁকে না। 'যাক্, দিগ্বিজয় করেছো। ও জাপানি জিনিশ দু-আনায় পেতে।'

'হ্যাঁ—ছ-টা পেন্সিল দু'আনায়—খেপেছো!'

বৌদি হেসে ফেললেন।—'থাক, হয়েছে। এখন হাত-মুখ ধুয়ে এসো।'

'উঃ!' এতক্ষণে সন্ধ্যামণির কথা ফুটলো। 'লাল! সবুজ! নীল! এ-দিয়ে ছবি আঁকবো?'

'হ্যাঁ, ছবি এঁকে-এঁকে আমাকে দিবি।'

তারপর কয়েকদিন উন্মত্তভাবে ছবি আঁকা। শাদা কোনো জিনিশ দেখলেই তার উপর পেন্সিল বুলোবার লোভ যেন সামলানো যায় না। শাদা দেয়ালগুলোয় বিভিন্ন রঙের আঁকিবুঁকি। কিছুকাল পরে আর-এক পোঁচ চুনকাম করাতে হয়েছিলো—তার মনে আছে।

এমনি অনেক দিন, এমনি অনেক খুশি। ও-বাড়িতে সব চেয়ে ছোটো মানুষ সে, কিন্তু সমস্ত বাড়ি, বাড়ির সব-কিছু যেন তারই জন্যে, তাকে দিয়েই ভরা। কী অসম্ভব সুখে তার সেই ছেলেবয়সটা কেটেছে তখন বুঝতে পারেনি, এখন ভেবে অবাক লাগে। কোনো বারণ ছিলো না তার জন্য; কেউ তাকে কখনো বলতো না, 'ওটা কোরো না, ওখানে হাত দিয়ো না।' অবাধ স্বাধীনতায় রোদ-পোহানো দিনগুলো রুপোলি পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে চলেছে। সে যা খুশি তা-ই করতো, অন্যায় যে কখনো ক'রে না-ফেলতো তাও নয়। কিন্তু তা যেন কেউ লক্ষ্যই করতো না। অন্যায় ক'রে শাস্তি না-পাবার যে লজ্জা সেটাই যেন হ'তো সবচেয়ে বড়ো শাস্তি।

বৌদি মাঝে-মাঝে বলতেন, 'তুমি যে ওকে কখনোই কিছু বলো না—'

'কিছু বলাই সব চেয়ে বড়ো কথা নাকি ?'

ওকে কখনো কিছু বলবে না, স্বামীর এই ইচ্ছা বৌদি কদাচ লঙ্ঘন করেছেন। অনেক সময় সে তাঁর ধৈর্যের উপর জুলুম করেছে। কিন্তু মৃদুতম একটুখানি তিরস্কারের বেশি তাকে শুনতে হয়নি কখনো। এটা যেন সে তখনই বুঝতো যে তার প্রতি বৌদির এই ক্ষমা ঠিক নিজের অন্তরের প্রেরণায় ততটা নয়, যতটা অবি-দার মুখে চেয়ে। ঐ একটি মানুষ আছে, সে জানতো, যার কাছে তার প্রশ্রয়ের সীমা নেই। অন্তত ঐ একজনের কাছে সমস্ত পৃথিবী থেকে সে আলাদা, সে বিশেষ। সেটাই একটা আশ্চর্য ধারা এনে দিয়েছিলো তার জীবনে। মা-বাপের কাছে বহুসন্তানের ভিড়ের মধ্যে সে মিশে ছিলো; সেখানে এই মর্যাদা তার ছিলো না, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো দামই ছিলো না। কিন্তু এ-বাড়িতে—সে যে এমন পরিপূর্ণ, অবিমিশ্রভাবে সে, এটাই যেন মস্ত কথা; আর-কিছু কেউ আশা করে না তার কাছে। নিজেকে মূল্যবান মনে করতে পারার যে-আনন্দ, তা-ই যেন তার জীবনকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অবি-দা যখন বিলেতে গেলেন তার বয়স বারো। তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে গিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো, এবং ফিরে এসে রাত জেগে লম্বা এক চিঠি লিখে ফেলেছিলো। সে-চিঠি ডাকে দেয়া হয়নি, লিখে ফেলেই এত ভালো তার লেগেছিলো যে ডাকে

যে দিতে হবে সেটা কেমন ভুলেই গিয়েছিলো। বৌদি চ'লে গেলেন তাঁর বাপের কাছে, সে এলো স্কুলের হস্টেলে। সেখানে প্রথম কয়েকদিন তার ভারি মন-খারাপ লাগতো, প্রায়ই রাত্রে কাঁদতো সে। কিন্তু স'য়ে যেতে বেশি দিন লাগলো না; মাসখানেকের মধ্যে ভয়ানকরকম ভালো লাগতে আরম্ভ করলো। বারো বছরটা বাড়বার বয়স, নতুন পাতায়-পাতায় নিজেকে ছড়িয়ে দেবার বয়স, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠবার প্রবল ঝোঁকটা কোনো বাধাই তখন মানতে চায় না। তাছাড়া, পৃথিবীর সম্পূর্ণ নতুন একটা চেহারা তখন থেকেই যেন তার চোখের সামনে আস্তে-আস্তে খুলতে আরম্ভ করেছে। তার ভিতরে, তার শরীরে আর মনে, বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে কী যেন একটা হচ্ছে, ভালো ক'রে সে বুঝতে পারে না। বয়স অনুপাতে তার বাড় কিছু বেশি ছিলো, ছিপছিপে লম্বা তার শরীর যেন খুশির একটা ফোয়ারা। আর সেই শরীর যে সুন্দর এ-খবরটা কেমন ক'রে তার মনে একদিন পৌঁচেছিলো। নিজেকে দেখে নিজেরই অবাক লাগে যেন। আর ভালো লাগে— তার এই সুন্দর হওয়াটাকে এক-এক সময় এমন অদ্ভুত ভালো লাগে, অন্য সমস্ত ভালো-লাগা থেকে যা আলাদা।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে চিঠি আসে অবি-দার। রবিবারের ছুটির উপর দিয়ে সেই চিঠি পাওয়ার আনন্দ ঢেউ তুলে যায়। নতুন রকমের টিকিট আর ডাকঘরের ছাপ থেকে আরম্ভ ক'রে চিঠির শেষ কথাটি পর্যন্ত তার কাছে আশ্চর্য লাগে, নিঃশেষে নিংড়ে নেয় সমস্ত মন দিয়ে। আর শুধু চিঠিই নয়: ছবিওলা মাসিক-সাপ্তাহিকের

তাড়া, বই, রাশি-রাশি পোস্টকার্ডের ছবি, আরো কত ছোটো-খাটো উপহার। বন্ধুদের মধ্যে রানীর মতো অকৃপণ অজস্রতায় কতকিছু সে বিলিয়েছে। সবাই তাকে ঈর্ষা করতো, তাকে খাতির করতো, সমীহ করতো। জিনিশগুলো পাবার এবং উপভোগ করবার আনন্দের চাইতে অন্যদের তাক লাগিয়ে দেবার আনন্দ কিছু কম ছিলো না। বইগুলোর সে সব সময় সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারতো তা বলা যায় না। দু-এক পাতা প'ড়ে ভালো না-লাগলে পাতা উল্‌টিয়ে রেখে দিতো। হারিয়ে ফেলতো হয়তো। বই পড়বার জন্য সে-সময়ে খুব ব্যস্ত ছিলো না সে: অবি-দা যে তাকে এত সব ভালো-ভালো শক্ত বই পড়বার উপযুক্ত মনে করেন, এবং অন্যসব মেয়েরা যে সেটা জানতে পারছে, তার খুশির আসল কারণ ছিলো সেইটে।

অবিনাশ যতদিন বিদেশে ছিলো, সবচেয়ে বেশি চিঠি তাকেই লিখেছে। সব কথা সে বুঝতে পারতো না। কিন্তু তার অত বেশি ভালো লাগতো সেইজন্যেই, অমন আশ্চর্য ভালো লাগতো। সবটা বুঝতে পারলে তো পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফুরিয়ে যেতো। সে-সব চিঠি—তার অনেকখানি অবিনাশের নিজের সঙ্গে কথা বলা, যাকে লিখছে সে উপলক্ষ্য মাত্র। আর তাই সে যেন প্রায়ই ভুলে যেতো যাকে লিখছে সে কত ছোটো, কত কাঁচা। আর সন্ধ্যামণি লিখতো লম্বা-লম্বা উত্তর: কোনো কথাই উপেক্ষা করার মতো তুচ্ছ নয়, ভয় করার মতো বিরাট নয়। এক্সারসাইজ-খাতার লাল মার্জিন-আঁকা রুল-টানা কাগজে তার কাঁচা-হাতের অক্ষরগুলি যেন

খুশি সামলাতে না-পেরে এ-ওর গায়ে ট'লে পড়ছে। একসঙ্গে সবটা লেখা হ'তো না; ছেড়ে-ছেড়ে লিখতো সারা সপ্তাহ ভ'রে। বিষয়ের অভাব হ'তো না কখনো: তার তখন যে-বয়স তাতে আশে-পাশে সব সময়ই এমন-কিছু ঘটছে, এমন-কিছু দেখা যাচ্ছে যা ভয়ানকরকম আশ্চর্য। আর অবি-দা তাকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার নিঃসংকোচ সাহস: যেটা বলতে চায় সেটা না-বলবার যে কোনো কারণ থাকতে পারে তা বুঝতে পারার দুর্ভাগ্য তখনো তার হয়নি।

ঐ একজনের হাতের ছাপ তার সমস্ত জীবনে। অত দূরে থেকেও তার মুঠি শিথিল হয়নি। তার আসন্ন যৌবনের নতুন অনুভূতিগুলি অবিনাশেরই মনের উত্তাপে ফুটে উঠেছিলো, সে নিজে তা বুঝতে পারেনি। ঐ বয়সটায় মন চায় একজনকে ভালোবাসতে—সে-ভালোবাসা ভক্তির মতো—যার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, যে দেবে এখন-পর্যন্ত-অজ্ঞাত জীবনের টুকরো-টুকরো আভাস, যার অনুমোদনে, যার প্রশংসায় প্রতিটি ছোটো কাজ সার্থক মনে হবে। আর সন্ধ্যামণি! সেই মানুষকে পেয়েছিলো পরিপূর্ণ ক'রে, যদিও ঠিক সেই সময়ে অনেক হাজার মাইলের ব্যবধান মাঝখানে।

যতই সে বড়ো হ'য়ে উঠতে লাগলো, ততই সে অবিনাশকে গভীর ক'রে গ্রহণ করলো তার জীবনে: তার সমস্ত কাজে, সমস্ত চিন্তায়, সমস্ত আশায়। সচেতন কোনো প্রক্রিয়া সেটা নয়: জীবনের দ্রুত স্রোতের যেটা অদৃশ্য উৎস, সেখানে অবিনাশের নিঃশব্দ

সঞ্চার; তার প্রাণের অলক্ষিত, অশ্রান্ত প্রেরণা। যেমন বৃষ্টির সরু-সরু জল বাড়ন্ত গাছের শিকড়ে-শিকড়ে। যেমন সূর্যের আলো কুঁড়ির মুখের উপর। অযাচিত, অফুরন্ত এই ঐশ্বর্য: সেখানে সন্ধ্যামণির চরম নির্ভর, তা কখনো নষ্ট হবার নয়। সেখানে সন্ধ্যামণির পরিপূর্ণতা। এতদিন তার শিশু-প্রগল্‌ভতায় দু-হাত ভ'রে অজস্র অপব্যয়ে সে নিয়েছে; কেবলই তার চাওয়া, কেবলই তার দাবি, আর কেবলই খেয়ালের উচ্ছ্বাসে দু-হাতে জল-ছিটোনো। জলের মতো সে ছিটিয়ে ছড়িয়ে গেছে, তার শৈশবের মনোহীন উল্লাস রঙিন ফোয়ারার মতো উচ্ছল। কিন্তু এখন তার জীবন ঝেঁকে-ঝেঁকে ঝরিয়ে ফেলছে ছেলেমানুষির আঁশ; নিজেকে ঘিরে উল্লাসের ঠাশবুনোনে মাঝে-মাঝে ছেদ পড়ছে, আর সেই ফাঁক দিয়ে চকিতে যেন সে নিজেকে দেখতে পায়। আর তার অবাক লাগে—সবচেয়ে অবাক লাগে যে এমন একজন মানুষকে সে পেয়েছে, যার কাছে তুলে ধরতে পেরেছে তার সমস্ত জীবন, পেয়েছে সেই আত্ম-নিঃশেষিত সমর্পণের নিশ্চিন্ত মুক্তি। শিশুকাল থেকে তার মধ্যে এমন ক'রে জড়িয়ে মিশে ছিলো যে এতদিন তাকে ঠিক দেখতেই পায়নি। আজ অনেক হাজার মাইল দূরে থেকে সে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠলো। যে ছিলো নিতান্তই ঘরের মানুষ, কাছের মানুষ, প্রতিদিনের তুচ্ছতায় জড়ানো, আজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে স্বতন্ত্র-দীপ্তিময় হ'য়ে সে দেখা দিলে। দেবতা হ'য়ে উঠলো সে, সুদূর দেবতা, জীবনের হাজার অস্থির ক্ষণকালের মধ্যে একটা ধ্রুব সত্য।

প্রথম যৌবন কেবল ভালোবেসে খুশি হ'তে পারে না, সে চায় পূজা করতে। সে-পূজায় তার নিজেরই প্রয়োজন, তার ধোঁয়ায় সে-ই ওঠে সুরভি হ'য়ে। তার শরীর-মনের বিপ্লব আর উপপ্লবের মাঝখানে খুব দৃঢ় ক'রে কোনো-একজনকে ধারণা করতে না-পারলে সে শান্তি পায় না। একজনকে সে চায়, যে হবে তার অদৃষ্টের মতো। যে বিরাট, যে দুর্বোধ্য, যে অপরূপ। সমস্ত অস্থির আলোড়নের আড়ালে কোথাও একটা নিশ্চিন্ততা, একটা অনতিক্রম্য স্থৈর্য। নবযৌবনের দুরন্ত স্রোতকে একটা বাঁধের মধ্যে ফেলে ধারালো ক'রে তোলা। একজনের মুখের দিকে মুগ্ধ ভক্তের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা: জীবনের সমস্ত কাজে, সমস্ত কথায় সেই দেবতার প্রসাদ-প্রার্থনা। তাতে এটা হয় যে মনের যে-সব সদ্য-জাগ্রত শক্তি এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে যেতে পারতো, তারা সেই একটা অভীষ্ট-লাভের কামনায় সুন্দর সামঞ্জস্যে গ'ড়ে ওঠে।

আমরা যদি মনে ক'রে দেখি, আমাদের অনেকের জীবনেই এই রকম কেউ-একজন ছিলো: হয়তো মা, কি বড়ো ভাই, কি কোনো শিক্ষক, কি বয়সে বড়ো কোনো বন্ধু। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই মোহটা কেটে যায়: দেবতার কাদার খুর বেরিয়ে পড়ে, সাধারণ জনস্রোতে মিশে তিনি হারিয়ে যান। তাতে আপশোষ নেই: সেই ব্যক্তিকে দেবতা হ'তে হবে তা তো কথা নয়, দেবতা ব'লে তাকে ভাবতে পারাটাই বড়ো কথা। আর তার প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে গেছে, তখন আর মিথ্যা খোলশটাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া ক'রে লাভ নেই।

কিন্তু কখনো-কখনো এমন হয় যে বয়সের পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে দেবতারও রূপ বদলায়, পূজা থেমে যায় না। পূজার অনুষ্ঠানে প্রভেদ ঘটে, কিন্তু পূজার ভাবটা রক্তের মধ্যে মিশে যায়, সমস্ত জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন সন্ধ্যামণি দেখলে যাকে সে মনে ক'রে এসেছে সুদূর এবং অনির্বচনীয় দেবতা, জীবনের প্রত্যক্ষ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে কী সহজ, কী অকুণ্ঠিত-আনন্দময় তার প্রকাশ।

অবিনাশের ফিরে আসার সময় হ'লো, সন্ধ্যামণি সে-বছর ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। সান ফ্রানসিস্কো থেকে তার শেষ চিঠি যখন পেলো, সন্ধ্যামণি হঠাৎ চমকে জেগে উঠলো যেন। আর সে চিঠি পাবে না। চার বছর ধ'রে চিঠির ভিতর দিয়ে এমন সম্পূর্ণ, অবিমিশ্রভাবে যাকে সে পেয়েছে, সে আর একমাসের মধ্যেই আসবে এখানে; তাকে দেখতে হবে, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ তো হবারই; তবু, সেই মুহূর্তে সন্ধ্যামণির মনে হয়েছিলো এ না-হ'লেই যেন ছিলো ভালো। যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে বাল্যের স্মৃতি কেমন ঝাপসা হ'য়ে আসে: যে-অতীতটা এইমাত্র আমরা পিছনে ফেলে এসেছি তার প্রায় কিছুই মনে করতে পারিনে। সেই তার পুরোনো, ছেলেবেলাকার অবি-দা এখন তার কাছে অর্থহীন। এই চার বছরে তাকে সে প্রায় ভুলেই গেছে। আর-একজনকে সে পেয়েছে, সৃষ্টি করেছে, কল্পনার মেঘে-মেঘে তার ছবি। এই ভৌগোলিক বিচ্ছেদের শেষের দিকে অবিনাশ তার পক্ষে প্রায় নিছক একটা ভাবপুঞ্জ হ'য়ে উঠেছিলো:

সে যে রক্তমাংসের একজন মানুষ সে-খেয়ালই তার ছিলো না। আর এখন সে ফিরে আসছে : তার কাছে তাকে যেতে হবে, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বুক কাঁপতে লাগলো তার। কেমন একটা ভয় : অদ্ভুত একটা লজ্জা, যা এর আগে সে কখনো জানেনি।

দেখা হ'লো। বৌদি ছিলেন ঘরে, দরজার কাছে সে ইতস্তত করছিলো। বৌদিই ডাকলেন, 'কে, সন্ধ্যা ? আয়।'

একটা প্রবল অদৃশ্য বাধা ঠেলে সরিয়ে সে ঢুকে পড়লো। অবি-দা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার উপর চোখ পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে চুপ ক'রে গেলেন, সে বেশ বুঝতে পারলে। একটু সময়, তাঁর বিস্ময়ে স্তব্ধ দৃষ্টি একটা কণ্টকিত অস্বস্তির মতো তার মুখের উপর ফুটতে লাগলো।

তারপর সে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে।

অবি-দা তার কাঁধের উপর মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, 'কেমন আছো ?' তাঁর মুখে এই প্রথম তুমি শুনে সে লাল হ'য়ে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেকে চেষ্টা ক'রে বললো, 'তুমি অনেক ফর্শা হয়েছো।'

'আমি ভেবেছিলুম তুমি কালই আসবে,' বললো অবি-দা।

'বাবার চিঠি আজ এসে পৌঁছলো : হস্টেল থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে এলাম।'

'মোটে তিন দিন কেন ?'

'আরো নিতে পারি। তুমি কলকাতাতেই থাকবে ?'

সেদিন বেশি আলাপ হয়নি; একটু পরেই কোনো-একটা

অছিলায় উঠে গিয়ে সন্ধ্যামণি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু কয়েক-দিনের মধ্যেই কেমন সহজ হ'য়ে গেলো সব। কী আশ্চর্য সহজ। জীবনে লাগলো উৎসবের সুর। অবি-দা যেন সমস্ত আকাশকে খুলে দিলেন তার জন্য; সেখান থেকে ঝ'রে পড়ছে রাশি-রাশি আনন্দ। তিনি ইউনিভার্সিটিতে প্রোফেসরি নিলেন, সে ঢুকলো কলেজে। তারপর এই ক-টা বছর একটানা একটা গানের সুরের মতো কেটে গেলো। সব সময়, তার জীবনের নেপথ্যে ছিলো ঐ একজন মানুষ, অদৃশ্য বায়ুমণ্ডলের মতো তাকে আচ্ছন্ন ক'রে। যা-কিছু সে করেছে সবই যেন তার জন্য। পরীক্ষাগুলোয় সে ভালো ক'রে এসেছে: তার নিজের গরজে ততটা নয়, যতটা ঐ একজনকে খুশি করতে পারার উৎসাহে। আর ছেলেবেলা থেকে নিজেকে সে সাধারণ থেকে আলাদা ব'লে ভাবতে শিখেছিলো। যেমন সব বাঙালি মেয়ের বিশেষ একটা বয়সে বিয়ে হ'য়ে বিশেষ একটা খাদে জীবন থিতিয়ে বসে, সে-রকম তার কখনোই হবে না তা সে জানতো। নেশার মতো উদ্দীপনা: আমি কী না করতে পারি? কী না হ'তে পারি? নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিলো তার; নিজের প্রতি হীনতা অন্যের প্রতি হীনতার মতোই অন্যায়, এ-ই সে ভাবতে শিখেছিলো। নিজেকে সে বঞ্চনা করবে না: উৎসবময় জীবন, উৎসবের অন্তহীন যজ্ঞ, সেখানে সে দীক্ষা নেবে। এমনি ক'রে এই ক-টা বছর সে কাটিয়ে এলো—স্বতঃস্ফূর্ত, আত্ম-অচেতন আনন্দের বৈকুণ্ঠলোকে।

সেই স্বর্গ থেকে আজ সে ভ্রষ্ট হ'লো কেমন ক'রে? চোখ বুজে

সে অন্ধকারকে দেখতে লাগলো। বড়ো আলো ঘরে, তার চোখ থেকে বেগনি রঙের অন্ধকার নিঃসৃত। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে হ'তো। হাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। তবু যথেষ্ট অন্ধকার নয়, অন্ধকার যথেষ্ট নয়। আরো আলো, আরো আলো মোর নয়নে প্রভু ঢালো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি কখনো জেনেছেন আলোয় যে-আতংকের ভীষণতা? ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু। কিন্তু ক্লান্তির তিনি কী জেনেছেন? জীবনের ক্লান্তির আর আতংকের আর হতাশার কী জেনেছেন? অন্ধ ক'রে দাও, আমাকে অন্ধ ক'রে দাও: আলো আর সইতে পারিনে। মুছে যাক এই আকাশ, নিষ্ঠুর নগ্ন এই আকাশ: ভেঙে পড়ুক আলোর এই পাষাণপুঞ্জ। যাই যাই ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই। আলোয় নয়, জ্যোছনায় নয়: অতল তরল অন্ধকারে। ঘুমের, বিস্মৃতির, করুণার, শান্তির।

সত্যি অবাক লাগে মৃত্যুকে বৌদি এমন ভয় করেন। যে-কোনো মহান উপভোগের প্রধান একটা কারণ হচ্ছে যে সেটা শেষ হয়। একটা বই লেখার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ নাকি সেটা শেষ করতে পারা। আর জীবন তার চেয়েও কত বড়ো অভিজ্ঞতা, কত বড়ো আনন্দ: সেটা শেষ করাতেই বা চরম আনন্দ নয় কেন? কতকাল, আর কতকাল নিজের মধ্যে এই ছিঁড়ে যাওয়া? একদিন সমস্ত শেষ হবে, এ-ই তো আশ্বাস।

কিন্তু বৌদি চান না শেষ ক'রে দিতে। ছাঁচে-ঢালা, তৈরি-করা ছিলো তাঁর জীবন; মাপসই জামার মতো আরামের। জামার

ধারগুলো একটু যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে তিনি শেলাই ক'রে নেবেন। ছাড়বার কথা ওঠে না। আরামের মসৃণতা : মসৃণ, চিক্কণ, তৈলস্নিগ্ধ ভালো-থাকা। টানা একটা সুর : কোথাও খোঁচ নেই। জীবন তাঁকে ভাবিয়ে তোলেনি কখনো। অনেক সময় কষ্টের মনে হয়েছে হয়তো, কিন্তু ভাবিয়ে কখনো তোলেনি। খারাপ লেগেছে, ভালো লেগেছে : আশ্চর্য কখনো লাগেনি, অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কী যে হবে আর কেমন ক'রে হবে, অনেক আগে থেকেই মনে-মনে সেটা জানা। এইটে ভালো, এইটে মন্দ : স্পষ্ট খাঁজ-কাটা। এমনি করতে হয়, এমনি বলতে হয়। মোটা-মোটা রঙে আঁকা জীবনের ছবি। কোনো বাধা নেই নিজের ভিতরে, কোন দ্বিধা নেই। একটানা, সমতল, মসৃণ। এই নিশ্চিত স্পষ্টতা ছেড়ে কেমন ক'রে তিনি ঝাঁপ দেবেন মৃত্যুর কালো সমুদ্রে, যেখানে অসীম রহস্য, অন্ধকার যেখানে চিহ্নহীন, দিগন্তহীন, আর নিবিড়, আর নিরবয়ব, আর অবিনশ্বর।

আর সেইজন্য তাঁর চোখ চিরকাল আলো-পিপাসু, এখনো আলো-পিপাসু। আরো আলো, আরো আলো : রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু আলাদা রকমের অর্থে। আরো স্পষ্টতা, আরো চিহ্নময়তা। আরো বেশি দেখতে পাওয়া : কোনোখানে ফাঁক থাকবে না, কোনো-কিছু ফাঁকি দেবে না। আর তাই তো তাঁর চোখ খোলা, অবিচল ভয়ংকর সংকল্পে। তিনি দেখবেন, তিনি লক্ষ্য করবেন। মৃত্যুর গোধূলির ভিতর দিয়ে তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি। একটা ছায়া, কোথায় যেন একটা ছায়া লুকিয়ে আছে। সেটা ধরা

পড়েছে তাঁর মৃত্যুচ্ছেদী চোখে। একটা ছায়া, অস্পষ্ট, রেখাহীন—থেকে-থেকে হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠছে। ভয়। হাড়ে-হাড়ে ভয়ের অস্ফুট শিহরণ। কিসের এ-ছায়া—তাঁর স্পষ্ট-রেখায়িত, নিখুঁত সামঞ্জস্যে নির্মিত এতদিনের জীবনে? দিনের পর দিন কত যত্নে গ'ড়ে-তোলা এই জীবন—এই জীবনই কি আজ ধ্বংস করবে তাকে, পুরোনো কাপড়ের মতো ফেঁড়ে ফেলবে মাঝখান দিয়ে? হঠাৎ কি একটা ঝড় ভেঙে পড়বে—লুঠ ক'রে নেবে সব, চুরমার ক'রে ভেঙে দেবে, দেবে ছারখার ক'রে? কেমন ক'রে সে মরবে, যখন চোখ মেলে দেখছে ছায়ার মেঘে লুকোনো এই ঝড়? সে নিজে যে মরবে সেটা হয়-তো সইতো: কিন্তু যে-জীবন সে পিছনে ফেলে যাবে তার নষ্ট হওয়াটা কিছুতেই সইবে না। তা নষ্ট হ'তে দিতে পারে না সে। কেমন ক'রে সে মরবে? না, মরলে চলবে না, শুকনো, কুঁকড়োনো ঠোঁটে ধবধবে বালিশটা স্পর্শ ক'রে শোভনা মনে-মনে বললে, আমার মরলে চলবে না। বাঁচতে আমি চাই, আমায় বাঁচতেই হবে। কখনো, এই অতি কঠিন, অতি জটিল, দীর্ঘ অসুখের মধ্যে—কখনো একবার তার মনে হয়নি যে সে মরবে। তবু সে জানতো। জানতো যে তার জীবনের আশা নেই। সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র সাঁৎরে পার হ'য়ে সে চলেছে, চলেছে মৃত্যুরই দিকে। সে তা জানে। বুঝতে পারে। শাদা, ফাঁকা দেয়াল, শিশি-গেলাশ-সাজানো ঐ টেবিলটা, কালো-দাগ-কাটা গোল-মুখো ঘড়ি—ঐ কথাই তাকে বলছে, চুপি-চুপি। তোমাকে মরতে হবে, তোমাকে মরতে হবে। কিন্তু একটুও ভয় করে না তার। হাসি

পায় বরং। বিশ্বাস হয় না, ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। না : হ'তে পারে না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না। বালিশের উপর আরো একটু শক্ত ক'রে মুখ চেপে ধরলো। ল্যাভেণ্ডারের ক্ষীণ গন্ধ। কেমন শুকনো, সূক্ষ্ম-মিষ্টি, দেহহীন সৌরভ, প্রেত-সৌরভ। মৃত্যুর গন্ধ। মৃত্যু, মৃত্যু। মরলে মানুষ কী হয়? আকাশে তারা হ'য়ে ফুটে থাকে? নরকের গরম কড়াইতে ভাজা হয়? স্বর্গের ফুলের বাগানে হাওয়া খায়? ভূত হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়? ছেলেবেলায় তার দাদা প্ল্যানচেটে প্রেতাত্মা আনাতেন। নিজে কতদিন বসেছে তেপায়া টেবিলে, অন্ধকারে। অদ্ভুত, অচেনা সব ভূত এসে উপস্থিত হ'তো। ভয় করতো, ভালো লাগতো। তারপর একদিন ধরা পড়লো বুজরুকি। দাদার সব কাণ্ড। দাদা : তিনি এখন স্বর্গে। স্বর্গে : রাস্তাটা কোনদিক দিয়ে? সে আশা করেছিলো দাদাকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে। কত গল্প শোনা যায়··· কত অন্ধকার রাত্রে একা ছাদে ব'সে থেকেছে···কত গল্প তো শোনা যায়। এমনি মুছে যাবে সে-ও কি? ছায়ার মূর্তিতে দেখা দেবার ক্ষমতাও থাকবে না? এই শরীরটার মধ্যে কী আছে যাতে তা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমিও শেষ হ'য়ে যাবো? শরীরটা কি আমি? আমি, আমি। শোভনা রায়, পিতার নাম তারিণীচরণ ঘোষ, অবিনাশ রায়ের স্ত্রী, বয়স বত্রিশ। এই আমি আর থাকবে না। নামটা থাকবে : শোভনা রায়, তারিণীচরণ ঘোষের তৃতীয়া কন্যা, সতেরো থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত অবিনাশ রায়ের স্ত্রী। থাকবে তার পরিচয়। মাঝে-মাঝে কেউ তার কথা বলবে হয়তো। থাকবে

এই বাড়ি; তার রোগের এই শাদা ঘর; এই খাট—তার বিয়ের, তার মৃত্যুর খাট। এই সমস্ত জিনিশ নিয়েই তো আমি: এই বাড়ির প্রত্যেক কোণে-কোণে আমি জড়ানো। আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে? উপড়ে ফেলবে? তার আমি দিয়ে তৈরি এই সমস্ত-কিছু থাকবে: থাকবে না আমি। কেন? না, শরীরটা যাবে। এত দাম এই শরীরের কে জানতো। শরীর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে তাকে শেখানো হয়নি। বিয়ের আগে যে বিশেষ একটু যত্ন, তা-ও নয়। মা অন্য রকম মানুষ ছিলেন: ঘষা-মাজা ফিটফাট ভাবটা প্রশ্রয় পেতো না। ভালোও লাগতো না। ছেলেবেলা থেকে অন্য রকম অভ্যেস। এটা কর, ওটা কর। পান সেজে দে। খোকার দুধ জ্বাল দিয়ে আন। আলুগুলো কুটে ফ্যাল না। খামকা চুপ ক'রে একটুখানি ব'সে থাকাও ভালো দেখায় না। মানায় না মেয়েতে। শরীরটা কি কেবল পুষে রাখবার? তা দিয়ে কিছু যদি না-করলে, কিছু যদি তৈরি না-করলে। ক্ষয় তো আছেই; কিন্তু অন্য দিক দিয়ে কিছু যদি জমিয়ে তুলতে না-পারলে, নেহাৎই ক্ষয় হ'লো। জমিয়ে সে তুলেছে, প্রাণপণে; এতটুকু কণাও ছেড়ে দেয়নি। তার সংসারের এই নিটোল ডৌল। শরীরের কথা কখন ভাববে, সময় ছিলো না। দরকারও ছিলো না। আশ্চর্য স্বাস্থ্য সে পেয়েছিলো: মাথা ধরেনি কখনো।

আর আজ সে তিনমাস শুয়ে আছে। মরছে। বলে, কোনো অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মরলে মুক্তি হয় না, ফিরে আসতে হয়।

পুনর্জন্ম। জন্মান্তরে তোমাকেই যেন পাই: পাতালে প্রবেশ করবার সময় সীতা বলেছিলেন। বলেছিলেন নাকি? স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরা: আহা, এমন পুণ্যবতী কে গো? মানুষের মাথায় চ'ড়ে কেওড়াতলার দিকে যাচ্ছে, কপালময় সিঁদুর। আহা, এমন কপাল নিয়ে কে এসেছিলো? শোভনা রায়, অবিনাশ রায়ের স্ত্রী। দড়ির খাটে শুয়ে, মুখের উপর জ্বলজ্বলে রোদ। মুখে আগুন দেবেন স্বামী। কী হয়েছে সে দেখতে! কোনোকালে কি সুন্দরী ছিলো? মন্দ হয় না, শরীরটা যদি আবার নতুন ক'রে তৈরি হয়। আশা করি এবার বিধাতা কৃপণতা কম করবেন। জন্মান্তরে তোমাকেই যেন পাই। কিন্তু পরের জন্মে অবিনাশের তো বয়সে অনেক ছোটো হবার কথা। আরো চল্লিশ বছরের মধ্যেও তার মৃত্যু নাও-হ'তে পারে। তাহ'লে?

না, কী হবে তা সে জানে। সে ঠিক জানে প্রেত হ'য়ে সে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে এই বাড়িতে, চুপচাপ রাত্তিরে। কেউ হয়তো তাকে দেখবে। আকাশে তারা হ'য়ে নয়, পরজন্মের কোনো মাতৃগর্ভে নয়। এখানে, এখানে। হাৎড়ে ফিরবে, দেয়ালে-দেয়ালে, বারান্দা দিয়ে ছায়ার মতো চ'লে যাবে, দাঁড়িয়ে থাকবে সিঁড়িতে চুপ ক'রে। সে, এই বাড়ির সমস্তটা ভ'রে। সে, শোভনা রায়, অবিনাশ রায়ের স্ত্রী। এই জীবন সে ছাড়তে পারে না, এই বাড়ির সঙ্গে অসংখ্য অদৃশ্য পাকে-পাকে সে জড়ানো। না, না, কিছুতেই ছাড়তে পারে না, এতদিন ধ'রে একে সে জমিয়ে তুললো, তা কি এইজন্যে? ছাড়তে পারবে না;

অন্য একজনের হাতে তুলে দিতে কিছুতেই পারবে না সে। দেবতা, আমাকে দয়া করো; আমাকে বাঁচতে দাও।

দেবতা কি আজ তাকে ভুলতে বসেছেন? তবু একদিন তার মনে হয়েছিলো, দেবতার বিশেষ দয়া তার উপর। জীবনে সে যা চেয়েছিলো তা তো পেয়েছে। কী না পেয়েছে? শুধু একটা ছেলে—কিন্তু কে জানে, এখনো হয়তো হ'তে পারে—হ'তে পারতো। মোটে বত্রিশ। সে কোনো নালিশ করেনি ভাগ্যের কাছে—যদি বা কখনো করেছিলো তা অতি ক্ষীণ, এত ক্ষীণ নিজেও ভালো ক'রে শুনতে পায়নি। মনে-মনে জীবনকে সে যেমন ক'রে ভেবেছিলো, তেমনি পেয়েছিলো। কিন্তু তা কি এইজন্যে—এইভাবে যে তা নিঃশেষে, নিঃশব্দে ছেড়ে দিতে হবে; আর অন্য একজন তা কেড়ে নেবে, নিজের ক'রে নেবে তারই চোখের উপর?

দীর্ঘ, দীর্ঘ এই রোগে শুয়ে-শুয়ে সে ভেবেছে, কেবল ভেবেছে। ভাববার এমন অবসর কখনো আসেনি তার জীবনে। সমস্তটা জীবন ফুটে উঠেছে আশ্চর্য স্পষ্ট রঙে: এত জিনিশ তার মনে আছে সে জানতোও না। এমনও তার মনে হয়নি যেন অন্য একজনের গল্প ছবির মিছিলে তার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত: ঐ জীবনের সঙ্গে এখনো তার রক্তের নিবিড় সংযোগ। টনটন করে বুকের মধ্যে। লোকে বলে, অনেকদিন রোগে ভুগলে সমস্ত জীবন কেমন অস্পষ্ট, অবাস্তব হ'য়ে ওঠে; শিথিল হ'য়ে আসে অতীতের গ্রন্থি। কিন্তু তার বুকের মধ্যে টনটন ক'রে ওঠে এখনো যে। এতদিন সে

শুধু বেঁচে গেছে, জীবনকে নিশ্চিত বিশ্বাসে গ্রহণ ক'রে গেছে: আজ ভেঙে যাচ্ছে সেই বিশ্বাস; যাকে জানতো ধ্রুব তাতে ভয়ংকর ফাটল ধরেছে; তার জীবনের সমস্ত মূলগুলো উপড়ে তুলে আনছে কে যেন। ওঃ, এ যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি কষ্ট।

জীবনকে বড়ো সহজে সে পেয়েছিলো, সুখের কাঙালপনা তাকে করতে হয়নি। সুখ: সুখ কাকে বলে? অদৃষ্টের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করা আমাদের মানায় না। দেবতা যা দেন খুশি হ'য়ে নিতে হয়। তার মা-কে সে দেখেছিলো। দেখেছিলো, সংসারের সমস্ত কর্তব্য আর দায়িত্ব আর দুঃখের ভিতর দিয়ে স্ত্রীলোকের জীবন কেমন পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। কেবল সুখের কথা নয়। কেবল সুখ নিয়ে জীবন কাটে? গভীরতর, স্থায়ীতর কিছু। যাকে আশ্রয় করা যায়, নির্ভর করা যায় যার উপর। তা নিছক উপভোগের বস্তু নয়; সমস্ত জীবনকে তা ভ'রে রাখবে। স্ত্রীলোক যদি তা-ই না পেলো, কী নিয়ে সে বাঁচবে? বিবাহে তার সেই পরিপূর্ণতা। বিয়ের আগে যে-জীবন, তা শুধু বিয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া। প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো সে। তার স্ত্রী-ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলো নিঃসংকোচে, পরিপূর্ণ ক'রে। প্রার্থনা করেছিলো তার স্ত্রী-সত্তা থেকে: আমি যেন আমার মায়ের মতো হ'তে পারি। বিবাহ সম্বন্ধে তার চিন্তায় স্বামীর স্থানটা গৌণ: স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে নিজের জীবন দিয়ে যে-গৃহ, যে-সংসার সে গ'ড়ে তুলবে, সেটাই আসল। অনেকদিন থেকেই মনে-মনে নিজেকে সে উৎসর্গ ক'রে রেখেছিলো—কার কাছে? জানে না। কিন্তু যে-ই হোক

সে, তাতে তো কিছু এসে যায় না। সে যে-ই হোক, যেমনই হোক, তারই ভিতর দিয়ে তো সে তার জীবনকে পাবে।

কপাল ছিলো ভালো: এমন হয়নি যে অনেক প্রত্যাখ্যানের পর শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে একজন স্বামী জুটলো। সেইজন্যই তো প্রথম থেকে ভাবতে পেরেছে যে দেবতা তার উপর প্রসন্ন। অবিনাশের সঙ্গেই তার প্রথম সম্বন্ধ আসে। বিবাহ ছিলো অনিশ্চিত: সতীশবাবুর নিজেরই মনে একটু দ্বিধা ছিলো। এ-বিবাহে তাঁর নিজের যে একটা উদ্দেশ্য আছে তাতে তাঁর মন স্বভাবতই কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠছিলো। কিন্তু সে-কারণটা অবিশ্যি তাদের বাড়ির কেউ জানতো না। বাবা ভাবতেন মেয়ে সুন্দরী নয় ব'লেই। কাকা মনে করতেন, স্বয়ং জেলার হাকিম, আরো উঁচু ঘরে লক্ষ্য তো হ'তেই পারে। কিন্তু তার নিজের মনে মুহূর্তের জন্য এতটুকু সন্দেহ হয়নি। সে যেন নিশ্চিত জানতো যে এখানেই তার বিয়ে হবে। একবার যাকে মনে-মনে স্বামী ব'লে ভেবেছে, সে তাকে ঠেলে যাবে কেমন ক'রে? অদৃষ্ট কি এতই নির্বোধ?

হ'লো বিয়ে, দেবতা তার মান রাখলেন। স্বামীকে তার মনে হ'লো ছেলেমানুষ। আর সত্যি, দু'জনের মধ্যে সে-ই তো বড়ো আসলে। বইয়ের গন্ধ গায়ে, রোগা! এমন সব কথা বলে হাসি পায়। কথা বেশি বলে না। লাজুক। প্রথমটায় বেশ একটু মজা লাগতো তার। বিয়ের পর দেড় বছর দিনাজপুরে: বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়িতে। বাপের বাড়িতেই বেশি। শ্বশুরের প্রতি গভীর একটি ভক্তির ভাব ছিলো তার মনে, তাকে তো তিনিই

গ্রহণ করেন। তিনি মাঝে-মাঝে আসতেন তাদের বাড়িতে: সে একটু লজ্জিতভাবে তাঁকে চা খাওয়াতো, মনে-মনে জানতো। তার স্বামীর পিতা, সে তাঁরই নির্বাচন। আমাকে পরীক্ষা ক'রে নাও, আমি ভয় করিনে। কিন্তু তাঁর সেই বিয়ে। তাঁর শ্বশুরের দ্বিতীয় স্ত্রী। হেডমিসট্রেস: বিধবা। পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে। একটু হয়তো মনে ধরলো, অমনি যদি আমরা বিয়ে করতে ছুটি, তাহ'লে এর শেষ কোথায়? সুজাতা-দিই (কিছুকাল সে স্কুলে পড়েছিলো) ফাঁদে ফেলেছেন। সন্দেহ নেই। নেহাৎ ভালোমানুষ বুড়ো ভদ্রলোক। ভালোমানুষরা পৃথিবীতে অনেক অসম্ভব কাণ্ড ক'রে থাকে। সুজাতা-দি দেখতে ভালো, ভালো গড়ন শরীরের। শাদা সিল্ক পরতেন। লম্বা কালো চুল পিঠ বেয়ে পড়তো। ভালো পাশ-দেনে-ওয়ালা, শুনেছে। ষোলো বছরে বিধবা হন। দু-বছরে লাফিয়ে যান ম্যাট্রিকুলেশনের বেড়া। আট বছর শিক্ষয়িত্রীগিরি করছেন। মেয়েরা পছন্দ করে। কিন্তু মাস্টারি ক'রে কাটবার নয় তাঁর জীবন। এখনো তাঁর ভিতরটার কিছুই যেন শুকিয়ে যায়নি। ঠিকই তো, বিয়ে না-ক'রে মেয়েরা করবে কী? একটু চেষ্টা করলে কাছাকাছি বয়সের কোনো যুবক তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু এই সাতচল্লিশ বছরের বৃদ্ধ! টাকা। কে না বোঝে? শুধু সেই ভদ্রলোক নিজে বোঝেন না, আর বোঝে না তাঁর ছেলে। স্বামীকে পাছে ও-সব কিছু বলো: সাবধান। ছেলেমানুষ। পুরুষমানুষের কবে কোন বিষয়ে খেয়াল থাকে। নবীনা বিমাতা সম্বন্ধে কোনো অসন্তোষ স্বামীর মনে ছিলো না। পুরুষমানুষের পক্ষে খুশি থাকা

আর শক্ত কী। তারা থাকে সংসারের বাইরের মহলে। বাইরের দিক থেকে যে-সম্পর্ক তাতে তো কোনো গোলমাল নেই। শুধু মেয়েরাই জানে ভিতরে যে-সব অদৃশ্য স্রোতের চলাফেরা। শুধু মেয়েরাই সমস্তটা দেখতে পারে, বুঝতে পারে। আর সেইজন্যই তাদের পক্ষে সব সময় ক্ষমা করা সহজ হয় না।

ভালো লাগেনি বিয়ের পরে এতগুলো সময় আলাদা হ'য়ে থাকা। বাপের বাড়ি আর তো সত্যিকার জায়গা নয়: এখানে ঠিক থাপ খাচ্ছে না যেন। আশ্চর্য। এই তো দু-দিন বিয়ে হয়েছে। আর এই সতেরো বছর এই বাড়িতেই সে মানুষ। কিন্তু এ-বাড়ি আর তার নয়। নানা ব্যাপারে বেশ বোঝা যায়। মা আর তাকে কোনো কাজের কথা বলেন না পারতপক্ষে। ছোটো বোন আসে পরিচর্যা করতে। সময়ই কাটতে চায় না। নভেল পড়া তার বারণ ছিলো: মেয়েদের বিয়ে না-হ'লে ও-সব পড়তে নেই। এখন সে-স্বাধীনতা সে পেয়েছে: লাইব্রেরি থেকে চামড়া-বাঁধানো বই আসে তার জন্যে। নিছক কৌতূহল থেকে পড়তে গিয়েছিলো প্রথমটায়। পড়তে পারেনি। বই পড়তে বেশি ভালো তার লাগেনি কোনোকালেও।

আশ্চর্য। বিয়ে হয়েছে, এই একটা মাত্র ঘটনা কী পরিবর্তন আনে স্ত্রীলোকের জীবনে। গড়পড়তা হিন্দু স্ত্রীলোকের বিয়ের পরেই তো প্রকৃত জীবন আরম্ভ। যা ছিলো সে, তা আর নয়। অন্য কিছু হ'য়ে উঠছে। জন্মসূত্রের যে-বন্ধন, তা আসছে ঢিলে হ'য়ে। এখন নতুন শিকড় গজানো, নতুন পাতা মেলে দেয়া, নতুন ক'রে থাপ

খাওয়ানো। নিজেকে মেলে দেবার সেই উৎসুকতা শোভনার মধ্যে সাধারণের চেয়ে অনেকটা বেশি ছিলো হয়তো। কোনোকালেই অলস নয় তার প্রকৃতি। সব সময়ই কিছু করছে। আশ্চর্য স্বাস্থ্য। কখনো মাথা ধরেনি; একটানা দু-দিন শুয়ে থাকেনি কখনো। সেই সমস্ত উৎসাহ আর শক্তি শূন্যতায় ঝ'রে পড়বে কেন? জীবনের সিংহদরজা দিয়ে একবার যখন ঢুকেছে তখন দেরি কেন আর? এখন সে চায় তার নিজের জীবন। গ'ড়ে তুলবে তার নিজের জীবন, তার নিজের বাড়ি।

শ্যামবাজারের সেই দোতলার ফ্ল্যাট। এত কম জায়গা, হাসি পায়। মফস্বলের উদার খোলামেলায় মানুষ হয়েছে, এই ইঞ্চি-মাপা ঘর-দরজা কী অদ্ভুত। বাড়িটা আর-একটু বড়ো হ'তে পারতো। এতে অবিশ্যি কুলিয়ে যায়, দু-জন মানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের জন্যেই কি সব? ভালো দেখানো ব'লে একটা কথা আছে। শরীরটাকে কোনোরকমে আরামে রাখতে পারলেই যদি মানুষ খুশি হ'তো তবে তো আর কথা ছিলো না। আসল তো মনের তৃপ্তি: মনেরই দরকার বাহুল্য। যা-ই হোক। স্বামী ইচ্ছে করলেই একটু বড়ো চালে থাকতে পারতেন। বাজে কলেজে আধা-উপোসি একটা মাস্টারি জুটেছে ব'লেই একেবারে 'স্বাধীন' হ'য়ে যেতে হবে তার কী মানে আছে? এমন নয় যে বাপের কিছু নেই। তার একমাত্র ছেলে। নববিবাহিতা বিধবা দ্বিতীয়বার বিধবা হবেন—সে-জন্য অনেকগুলো জমতে দিয়ে লাভ কী? কতই বা তাঁর দরকার হবে? দরকার হওয়া উচিত নয়,

হ'তে দেয়া উচিত নয়। মেয়েমাহুষের অত বেশি আলাদা পয়সা থাকবে কেন? শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর বাপের বাড়ির লোকের হাতে। এক ভাই আছে তাঁর, ব্যারিস্টর। ব্রীফহীন, আইনের নোট লিখে খায়। তার যে-আইনের বুদ্ধি হাইকোর্টে কখনো খুললো না তা হয়তো—কে জানে। উচিত নয় কি খরচ করা, ভার কমানো? বাপের পয়সায় লজ্জা কিসের?

কিন্তু অদ্ভুত মানুষ। কী অল্পেই খুশি। কলেজ আর বাড়ি: পৃথিবীতে আর-কিছু নেই। শরীরের এমন আলস্য। বেশ তো আছি, চমৎকার আছি। এ ছাড়া অন্য রকম কিছু যে হ'তে পারতো কি কখনো হ'তে পারে তা ভাবে না একবার। এত নাকি পাশ-টাশ করেছে—তারপর এই! মন্দ কী? বেশ তো আছি। সন্ধেবেলায় ছাতে পাটি বিছিয়ে শোবার মতো ভালো আর কী? এ-রকম লোকের যে কিছু হয় সেটা তার নিজের গুণে নয়, অদৃষ্টের গুণে।

যা-ই হোক। তবু তো তার নিজের বাড়ি। তার রাজত্ব। আড়াইখানা ঘর আর সরু একখানি বারান্দা নিয়ে তার রাজত্ব। এ-ই তো সে চেয়েছিলো। রেঁধে আর ধুয়ে আর ঘ'ষে আর মেজে, আর সাজিয়ে আর গুছিয়ে আর বাড়িয়ে—ভরা পেয়ালার মতো সে উপচে পড়ছে। ছাড়া পেলো সে, ছাড়া পেলো তার উৎসুক, অস্থির শক্তি। আর সেই মুক্তির আনন্দে সে নিজেরই মধ্যে ভ'রে উঠতে লাগলো। ছোটোখাটো অতৃপ্তি আর ক্ষোভ যা ছিলো তা কোনো বাধা সৃষ্টি করতো না, পেছিয়ে দিতো না: সমস্ত জিনিশটার তা একটা অংশ; তা ভালো হয়তো লাগে না,

কিন্তু এই ভালো-না-লাগাটুকু না-থাকলে একটা অসম্পূর্ণতা কোথায় যেন।

সুখী সে ছিলো, এখন ভেবে দেখছে। মেয়েদের এ-ই তো সুখ। কিন্তু আজকালকার ওরা তাকে সুখ বলবে না। ওরা কি নিজেরাই জানে কী ওরা চায়? বিয়ের কথা উঠলে ওরা বলে ভালোবাসা। যেন ভালোবাসা অন্য সব-কিছু থেকে আলাদা একটা জিনিশ। কিন্তু সেই ভালোবাসা নিয়ে কতদিন বাঁচবে তুমি? যাকে সমস্ত সংসার থেকে তুমি আলাদা ক'রে আনলে তা তোমাকে কতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? না, নিছক 'ভালোবাসা'র কথা নয়; সার্থক হ'য়ে ওঠা, সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠা। জীবনটাকে সম্পূর্ণ কাজে খাটানো। নানা উদ্দেশ্যে, নানা সংকল্পে, নানা আশায় নিজেকে ছড়িয়ে দেয়া। প্রাণ তো তা-ই নিয়েই বাঁচে। আর তা আমি পেয়েছিলাম, তা আমি নিতে পেরেছিলাম। স্বামীর সঙ্গে তেমন নিবিড় প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ তার ছিলো না—আজকালকার ওরা যেটাকে খুব মস্ত জিনিশ মনে করে। কিন্তু সেটা থাকতেই বা হবে কেন? এ-ই কি যথেষ্ট নয় যে তিনি স্বামী? আমার সমস্ত জীবন তো একদিনেই, একবারেই তাঁকে দেয়া হ'য়ে গেছে: আর কি? আর তারপর কি কুড়োতেই হবে প্রতিদিনের প্রসাদ, রোজ কি একবার নতুন ক'রে সই করিয়ে নেয়া চাই দলিলে? স্বামী তো অস্বস্তির মতো ব'য়ে বেড়াবার নয়, সমস্ত জীবনের মধ্যে নিঃশেষে মেনে নেবার। যে-বাতাসে তুমি নিশ্বাস নাও, তাকে কি তুমি টের পাও সব সময়?

স্বামী গেলেন বিলেতে: শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের চৈতন্য হ'লো। দু-একবছর আগে হ'লেও দোষ ছিলো না, স্বামী মুখ ফুটে একবার বললেই হ'তো। কিন্তু এমন মানুষ! বাবাকে আর বিরক্ত ক'রে লাভ কী? নিজের ন্যায়ের অধিকার যে ছেড়ে দেয়, তাকে লোকে কী বলে? আর এমন কুনো। ঘর থেকেই বেরোতেই চায় না। বিলেত যাবার প্রস্তাবে অবিমিশ্র খুশি হ'তে পারেনি। বেশ থিতিয়ে বসেছিলো, আবার সব ওলোট-পালোট। যেন এই হতচ্ছাড়া কলেজেই জীবন কাটবে। একটু মন-খারাপ তার নিজেরও হয়েছিলো বইকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে। একদিন সে স্বপ্ন দেখেছিলো স্বামী একটা বাড়ির প্ল্যান হাতে নিয়ে তাকে বলছেন: 'গ্যাখো তো, এটা পছন্দ হয় কিনা।' কী আশা, কী আনন্দ নিয়েই সেদিন তার ঘুম ভেঙেছিলো। যদি দেবতার মনে কিছু না-থাকবে, ঠিক স্বামীর রওনা হ'য়ে যাবার মুখেই এই স্বপ্ন সে দেখবে কেন? একে সন্দেহ করবে কেমন ক'রে?

আজ সে পেয়েছে তার পরিপূর্ণতা। এই বাড়িতে আটটা ঘর, যদিও জনসংখ্যা তাদের বাড়েনি। ঝি-চাকরে মিলে পাঁচজন। ঘরগুলো বড়ো বড়ো, দামি আসবাবে সাজানো। কাউকে খেতে বললে রুপোর বাসন বের করা যায়। একটা গাড়ি আছে: সেটা বিশ্রী, যদিও। লজ্জার ব্যাপার, দস্তুরমতো। কিন্তু ওঁর খেয়াল নেই। তার হাতে থাকলে এতদিনে নতুন গাড়ী আসতো নিশ্চয়ই। আজ এতদিন পরে এ-কথা কি একবার নিজের মনে বলতে পারে না যে এই বাড়ি, বাড়ির এই শ্রী আর সমৃদ্ধি আগাগোড়া তার একলার

হাতের তৈরি? কী সে করেছে, এই সমস্ত বছরগুলো ভ'রে, কী সে না করেছে! একহাতে প্রাণপণে বাঁচিয়ে অন্য হাতে বাড়িয়েছে। টাকা শুধু রোজগার করলেই হয় না, খরচ করতে জানতে হয়। সত্যি তাদের যা আয়, সে-তুলনায় তাদেরকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ মনে হয়। লোকে অবাক হয় না: ভাবে, বাপের পয়সা আছে, ভাবনাটা কী? সে তা বুঝতে পারে; বুঝতে পেরে মনে-মনে হাসে। মোটা-মোটা তার সব হিশেবের খাতা। স্বামী ফিরে আসার পর এই আট বছর ধ'রে জমানো। কাপড়ের দেরাজের কোণে রেখে দিয়েছে। একদিন বের করিয়ে এনে দেখতে হবে। ম'রেই যদি যায়, ঐ খাতাগুলো রেখে দেয়া হয় যেন: তার জীবনচরিত। তার আত্ম-জীবনী: রাশি-রাশি অঙ্কে লিখে গেছে। তার মধ্যে তার সমস্ত জীবনের সাধনা ও সিদ্ধি। ঈশ্বর তাকে সন্তান দেননি, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে পূর্ণ ক'রে তুলেছেন। চিরকাল সে বিশ্বাস ক'রে এসেছে যে ঈশ্বর আছেন তার পক্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কি এমন নিষ্ঠুরের মতো সেই বিশ্বাস ভাঙবেন? এখনই কি তাকে মরতে হবে?

মোটে বত্রিশ তার বয়স। এখনো অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক অসমাপ্তি, তার মনে অনেক নতুন সংকল্পের অক্লান্ত উৎসাহ। তার সেই স্বপ্ন সফল হয়নি এখনো। ভাড়াটে বাড়ি এটা। যদি মরতেই হয়, অন্তত তার নিজের বাড়িতে গিয়ে মরে যেন। জমি দেখা হচ্ছিলো নতুন বালিগঞ্জে। এতদিনে হয়তো বাড়ির কাজ আরম্ভ হ'য়ে যেতো, কিন্তু হঠাৎ তার এই অসুখ। কত টাকা

গেছে কে জানে? এক হাজার? দু-হাজার? মনে-মনে মোটামুটি একটা হিশেব করার চেষ্টা করে, তার ক্লান্ত মস্তিষ্কে বেশি দূর এগোয় না। দু-হাজারই হবে হয়তো। অত সব বড়ো-বড়ো ডাক্তার কেন? ডাক্তারই যদি মানুষ বাঁচাতে পারবে তবে আর অদৃষ্ট বলেছে কী করতে? আরো কত হয়তো হবে। আর এই সমস্ত-কিছুর পরে—তাকে কি মরতে হবে? দেবতা কি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন?

'যশোদা,' ক্ষীণস্বরে সে ডাকলো।

জবাব এলো না। 'যশোদা!' থাক। ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। শরীরটাকে ছড়াবার একটুখানি জায়গা পেলেই ঘুমিয়ে পড়বার ক্ষমতা যশোদার অসাধারণ। তেষ্টা পাচ্ছে, থাক। সন্ধ্যা বুঝি একটু শুয়েছে গিয়ে। শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে চোখ বুজলো। আঙুরের রস একটু খেলে হ'তো। শক্তি আনতে হবে শরীরে: যেমন ক'রে পারে, যতটুকু পারে। ক-টা বাজলো? থাক, চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না। চারটের কাছাকাছি হবে হয়তো। এমন চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে মনে হয় সময়ের যেন আর শেষ নেই। সমুদ্র। ডুবে যাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। দিনে ঘুমোবার অভ্যেস তার কোনোকালে ছিলো না: সবচেয়ে লম্বা যে-দিন, তা-ও কেমন অনায়াসে কেটে যেতো। একা; একা বাড়িতে। বিরক্ত করবে এমন একটা ছেলে পর্যন্ত নেই। বই পড়তো না, বেড়াতে যেতো না কোনো বাড়িতে। নিজের বাড়ির মতো ভালো আর কোথায় লাগে? বাড়ির বাইরে কী আছে সে কখনো জানতে

চায়নি। এতদিন কলকাতায়, থিয়েটার দেখেনি একদিন। স্বামী নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সে বলেছে, 'আমার ও-সব ভালো লাগে না, সন্ধ্যাকে নিয়ে যাও।' দাঁত দিয়ে সে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। আমার কী দোষ: এমন যে হবে তা কি তখন আমি জানতাম ?

একটু পরেই ও আসবে হয়তো। আর-একটা ওষুধ খাওয়ার সময় হয়নি কি ? একটু আঙুরের রস ? না বেদানার ? অকালের কমলানেবু। টক। তাহ'লেও ভালো। ভালো জিনিশ। যতটা পারো খাবে। আরো বেশি সে খেতে পারে না কেন ? যেটুকু খায়, সন্ধ্যারই জন্য। সন্ধ্যারই হাত থেকে। মাগো, ঐ-সব ভাড়াটে ফিরিঙ্গি নার্স ! সন্ধ্যারই হাতে সে এখন। যদি সে ভালো হ'য়ে ওঠে, সন্ধ্যাই তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। সবাই বলবে। তুমি আমাকে জীবন দিয়েছো, বাকি জন্মের মতো আমি তোমার কেনা। ঈশ্বর, আমার সব ইচ্ছা তুমি পূর্ণ করেছো, আর শেষ পর্যন্ত কি এমন অপমান আমার হ'তে দেবে ?

বেচারা, খাটতে-খাটতে মরলো। ও যে এত করতে পারে কে জানতো। পড়ুয়া মেয়ে। পাশ ক'রে মস্ত কিছু হবে, ছবি ছাপা হবে কাগজে। আর আজ ও নিজেকে নিংড়ে-নিংড়ে বিলিয়ে দিচ্ছে, আর-কিছু ভাবছে না। ওরে, মেয়ে তো! বালিশের উপর সে জোরে মুখ চেপে ধরলো। মেয়ে যে, সে কী না পারে ? সব পারে সে, মরতে পারে। আর তার একটাই কারণ, চিরকাল শুধু একটাই কারণ তার। যে-মেয়ে সমস্ত পৃথিবীর প্রতি হীন, সন্দিগ্ধ,

কুটিল, নিষ্ঠুর—একজনের জন্য, শুধু একজনের জন্য এমন-কিছু নেই যা সে না-করতে পারে।

কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়ে। ফুটফুটে ছোটো মেয়ে। স্বামীর মায়া পড়েছিলো ওর উপর। চিরকাল একা, ও-বয়সের শিশু তাঁর মনে হয়েছিলো কী অদ্ভুত আশ্চর্য। তেমন নয় তার। শিশু তার কাছে নতুন জিনিশ নয়। ছোট দুটি ভাইকে মানুষ করেছে। শিষ্টতার আদর্শ ছিলো না তারা। তার মাথার চুল তাদের হাতের মুঠির সঙ্গে অনেক উঠে এসেছে। জানতো শিশুরা কী দিয়ে তৈরি। কিন্তু সন্ধ্যা ঠিক সে-রকম ছিলো না তা ঠিক। তবু: শ্বশুরের দ্বিতীয় স্ত্রীর বোনের মেয়ে। ভালো লাগেনি তার। এত মাথামাথি দিয়ে কী দরকার? কিন্তু ওকে নিয়ে স্বামী কেমন মেতে উঠলেন। মনে-মনে সে একটু হাসলো: এমনি হয় আত্মীয়স্বজন ছাড়া হ'য়ে থাকলে। ভালোই: নিজের কাজের বাইরে যে-কোনো কিছুতে একটু আগ্রহ থাকা দরকার পুরুষমানুষের। বাড়ির বাইরে ওঁর কিছু নেই; মেয়েটাকে নিয়ে সময় কাটে তবু। তাদের সঙ্গেই থাক না ও; বাপের বদলির সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার কী দরকার। ও যে তার শ্বশুরের দ্বিতীয় স্ত্রীর বোনের মেয়ে তা তো আর ওর দোষ নয়। আর বাড়িতে আর-একজন মানুষ থাকলে ভালোই তো লাগে।

কী আশ্চর্য ও বেড়ে উঠলো, কী সুন্দর ও হ'য়ে উঠলো। ষোলো বছরে রানীর মতো দেখতে। তার একলার যদি হাত হ'তো, বিয়ে দিয়ে দিতো বয়স বেশি বাড়বার আগেই। কিন্তু স্বামী

অবশ্য ও-কথায় কানই দেবেন না। পুরুষমানুষের খেয়ালের অন্ত নেই। বিদ্বান হবে, বিদুষী হবে। আর এখন! যা-ই বলো না, স্ত্রীলোকের জীবনে আর কী আছে, আর কী আছে স্ত্রীলোকের জীবনে?

অবাক হ'য়ে গেলো, তার চোখ ভিজে। চোখ মেলে দেখলে, শাদা বালিশে কালো একটা দাগ। বালিশটা উল্টিয়ে নিতে পারলে হ'তো, কিন্তু এমন দুর্বল সে হ'য়ে গেছে। পাশ ফিরলো। পাশ ফিরতে লাগে। শরীরের হাড়গুলো সামান্যতম চলাফেরায় কঁকিয়ে ওঠে যেন। এই কষ্ট শিগগিরই শেষ হবে হয়তো। হাড়গুলো বিশ্রাম পাবে। আর তারপর। তারপর, তারপর। সব সে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট চোখে। সত্যি কি তাকে মরতে হবে?

৩

—'মণি!' বারান্দা পার হ'য়ে অবিনাশের স্বর ক্ষীণ হ'য়ে ভেসে এলো। হাতের তেলোয় একটু জল নিয়ে মাথার তালুতে সে চেপে ধরলো। বাথরুমটায় একটা পশ্চিম দিকের জানলা। মোটা কাচের ভিতর দিয়ে রোদের হলদে পাপড়ি। ঈষৎ-আর্দ্র, সাবান-সুরভি বাথরুমে হলদে বিকেল।

—'মণি! মণি!'

রাস্তার দিকে বড়ো-বড়ো দুটো জানলাওলা ঘরে অবিনাশ ডোরা-কাটা শার্ট প'রে দাঁড়িয়ে। কোটটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলা। জামা-কাপড়ের যত্ন নিতে শেখেনি কখনো।

অবিনাশ তীব্র ভঙ্গিতে ফিরে তাকালো।—'কোথায় থাকো?'

'কেন, হয়েছে কী?'

'ভাবছিলুম, কাপড়টা…' মিনমিনে স্বরে সে আরম্ভ করলো। কাপড়টা ঐ আলনার উপরেই তো ঝুলছে। না, এটা চলবে না। কিন্তু শুধু দরকারেই মানুষ ডাকে নাকি? 'না, ঠিকই আছে।' চেয়ারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে সে মাথা নিচু ক'রে হাত বাড়ালো' জুতোর দিকে।

'ফিতেটা খুলে দিই,' সন্ধ্যামণি এগিয়ে এলো।

অবিনাশ এমনভাবে হাত তুললো যেন কী সর্বনাশ হ'তে যাচ্ছিলো। কিন্তু এ এক যন্ত্রণা—এই পোশাক পরা আর পোশাক খোলা। গরমের দেশে এ-সব উৎপাত কেন? অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

গলাটা আঁটো হ'য়ে থাকে। রক্ত-চলাচল বাধা পায়। ইংরেজদের মুখ অমন লাল কি ঐজন্যেই? ফিতেটা একটু ঢিলে ক'রেই সে গায়ের জোরে টেনে খুলে ফেললো একটা জুতো।

'বেলের সরবৎ আনবো?'

অবিনাশ মাথা নাড়লে। বিশ্রী জিনিশ, পেটের মধ্যে ভারি হ'য়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে, বের ক'রে নিয়ে আসে সমস্ত। আশ্চর্য নির্গমন। কিন্তু আজ নয়: আজ সে ভালোই আছে।

'তাহ'লে যাই, তোমার চা—'

'হ্যাঁ, এখানে পাঠিয়ে দিয়ো।' নিচে যাবার আর উৎসাহ নেই; এমন ক্লান্ত। তিন ঘণ্টা ছিলো আজ। নিজের বক্তৃতা শুনে-শুনে তার নিজের হাড়গুলো ক্লান্ত। শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলির প্রথম স্ত্রী হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক। লিয়র লেখবার সময় শেক্সপিয়র নিজেও কি একটু পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন? আর ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতি-কল্পনা কি মানুষের আত্মারই একটা রূপ, যদিও সেই আত্মা প্রকৃতিরই একটা অংশ—মানে, মানুষের আত্মা কি প্রকৃতির মধ্যে মিশে গিয়ে তাকে প্রতিফলিত করে—মানে, যেটা আছে সেটা নয়, যেটা দেখা যাচ্ছে? না কি প্রকৃতির খালি পেয়ালা মানুষের আত্মায় ভ'রে ওঠে, অবশ্য সেই আত্মার প্রেরণা প্রকৃতি থেকেই, মানে, মানে। আর হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক সম্বন্ধে ডাউডেন কী বলেছেন, আর ডাউডেন যা বলছেন তার সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড কী বলেছেন, আর ডাউডেন যা বলেছেন তার সম্বন্ধে ম্যাথু

আর্নল্ড যা বলেছেন তার সম্বন্ধে আঁদ্রে মোরোয়া কিছু বলেছেন কি? আর ডাউডেন যা বলেছেন তার সম্বন্ধে ম্যাথু আর্নল্ড যা বলেছেন তার সম্বন্ধে আঁদ্রে মোরোয়া যা হয়তো বলেছেন তার সম্বন্ধে স্তর এডমণ্ড গস-এর একটা চিঠি কি ছাপা হয়নি টাইমস পত্রে? Heigh-ho! There was a young man named Fraser who—

পিঠ খাড়া ক'রে মোজা-পরা পায়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। ভিতরের দিকে নিশ্বাস্ টেনে নিয়ে পেটটা একবার ঢিল করলে। ওঃ, সে ক্লান্ত। দিনের কাজের পর। শ্রীল শ্রীযুক্ত অধ্যাপক তিন ঘণ্টা কাজ ক'রে এখন আর দাঁড়াতে পারছেন না। কপাল ভালো তার। লোকে দশ ঘণ্টা খাটে, তার উপর আরো দু-ঘণ্টা খাটতে বললে মনে-মনে ঈষৎ আপত্তি করে। কিন্তু সে যে বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন। তার যে মস্তিষ্কের কাজ। সত্যি, ডাউডেনের মতটা কী? বইটা দেখে নিতে হবে একবার। আর হঠাৎ সে আস্তে শিষ দিয়ে উঠলো।

O Mary Ann is a bonine lass,
A bonine lass is she,
O there is none like Mary Ann
In all this fair countree.

সন্ধ্যামণি তার পোশাকের পরিত্যক্ত অংশগুলো তুলে রাখছে।

একটু ফোলা-ফোলা ওর চোখ। অবিনাশ শিষ দেয়া থামিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'ঘুমিয়েছিলে নাকি ?'

'না, ঘুমুইনি। শার্ট-টা ছেড়ে ঐ কোণে ফেলে রেখো। ধোবাবাড়ি যাবে। কী খাবে চায়ের সঙ্গে ?'

'ওঃ, খিদে পাচ্ছে। তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় এই ঘুম থেকে উঠে এলে।'

সন্ধ্যামণি জুতো দুটো কুড়িয়ে আনলো।

'এই, কী করছো !'

'কী ?'

'জুতোতে হাত দাও কেন ? ধুলো। মাইক্রোব, জানো তো।' অবিনাশ দাঁত বার ক'রে হাসলো।

'কালি দেয়া দরকার। সিঁড়ির ওখানে রেখে দেবো, তাহ'লেই লছমনের চোখে পড়বে। তুমিই বা কী ? বলতে পারো না ওকে ?' জুতো দুটো হাতে ঝুলিয়ে সন্ধ্যামণি বেরিয়ে গেলো।

অদ্ভুত, এই মেয়েরা। কোনো কথা যদি বলা যায় এদের সঙ্গে। আছে নিজের মন নিয়ে, কী ভাবে ওরাই জানে। কোনো কথা বলছো, ফশ ক'রে উঠে গেলো। রান্নাঘরে কী জানি হচ্ছে। তেলওলার আসার কথা ছিলো। হয়তো মজার একটা গল্প বলছিলে। শোনো, আজ কী হয়েছে। ফাঁকা মুখ। মুখের চেহারা একটু ক্লিষ্ট, এমনকি। শোভাকে সে কখনো হাসাতে পারেনি কোনো গল্প ব'লে। শেষ পর্যন্ত শোনেইনি। যেটুকু

শুনেছে নেহাৎ দয়া ক'রে। আর যদি বা শেষ পর্যন্ত শুনেছে— 'তারপর?' O God! তারপর! আর তার মুখের পেশীগুলো সংকুচিত হ'তে আরম্ভ করেছিলো। কণ্ঠনালী শুড়শুড় করছে হাসির উৎসাহে। মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর হ'য়ে যেতে হয়। লজ্জা হয় নিজেরই।

কোমর ঢিলে ক'রে সে শার্টটা তুলে আনলো মাথার উপর দিয়ে। নিজের শরীরের ঘামে কটু গন্ধ প্রবেশ করলো তার নাসা-রন্ধ্রে। মাথাটা আটকে গেলো। ও! একটা বোতাম র'য়ে গেছে নিশ্চয়ই। প্রায়ই ভুল হয় তার। শার্টটা আবার নামিয়ে আঙুল দিয়ে দেখতে লাগলো। আমেরিকান শার্টগুলোই ভালো: কোটের মতো খোলে। কাপড়চোপড় আরামের যদি না হ'লো তবে হ'লো কী? শার্টটা উল্টিয়ে টেনে আনবার সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত চুল মুখের উপর এসে পড়লো। এটা ঐ কোণে রাখতে হবে। ধোবাবাড়ি যাবে। কিন্তু সত্যি, কেউ যদি এ-সব হিশেব না রাখে তাহ'লে চলে কী ক'রে? কাউকে এ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতেই হবে, সে যাতে নিশ্চিন্তমনে ইজি-চেয়ারে শুয়ে হালের উপন্যাস পড়তে পারে। আর, সে যে একটা হাসির গল্প শুনে হাসতে পারবে এটা হয়তো বড্ড বেশি আশা করা।

ধুতি প'রে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। উঃ! আর দেশে কিনা এমন লোকও আছে যারা বলে ধুতিই আমাদের সর্বনাশ করলো। কোঁচা! লম্বা, শাদা সাপ: আমাদের জাতির জীবনী-শক্তিকে শুষে নিচ্ছে। এ নিয়ে চমৎকার একটা আনন্দবাজারি

প্রবন্ধ লেখা যায়। এই যে আমাদের বেকার সমস্যা আর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, এই যে আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা আর ব্যবসায়ে অক্ষমতা, এই যে আমরা জীবন-যুদ্ধে ক্রমশই হেরে যাচ্ছি, এই যে কলকাতায় অবাঙালির প্রতিপত্তি কেবলই বেড়ে চলেছে—এর মূল কারণটা কী, জানেন? কোঁচা! কোঁচাকে ছাঁটতে হবে, কাটতে হবে—ছুরি দিয়ে, কাঁচি দিয়ে, কলম দিয়ে—যেমন ক'রে পারেন। কোঁচার নাগপাশ থেকে জাতির দেহকে একবার মুক্ত করতে পারলেই আমাদের মূর্ছা ভাঙবে: খাকি হাফ-প্যাণ্ট পরা বীর সৈন্যদল আমরা জীবন-সমরাঙ্গনে এমন সব আশ্চর্য কাণ্ড করবো যা চিরকাল লেখা থাকবে ইতিহাসে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের খোলা গায়ের দিকে সে তাকালো। মুখের চাইতে তার গা অনেক ফর্সা। সরু, কালো চুলের রেখা বুক থেকে সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। মাথার চুলের চাইতে একটু পাৎলা রঙের। কিন্তু এখন আর তার চুল কুচকুচে কালো নয়। লোহা-রঙের চুল। মাঝে-মাঝে কানের উপরে শাদা এক-একটা সুতো বেরিয়ে পড়ে। তার সমস্ত চুল যখন শাদা হ'য়ে যাবে কেমন দেখাবে তাকে? শুভ্র কেশের মহিমা! সে কি তখন বাবরি রাখবে আর গরদের ধুতি পরতে আরম্ভ করবে? কিন্তু তার বেশ স্পষ্ট ভুঁড়ির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—কোনো সন্দেহ নেই। কেবল ব'সে-ব'সে থাকার ফল। ধরো, এখন থেকে যদি কেবল বাড়তে থাকে। পঁয়তাল্লিশ বছরে বেশ গোল, থলথলে একটি ভুঁড়ি। বাবরি আর গরদের ধুতির সুর কেটে

যাবে। থামানো যায় না? কোনোরকম ডন-কসরৎ? লোকে বলে, স্কিপ করলে ক'মে যায়। আর যোগের কী-সব পক্রিয়া নাকি আছে···। থাক, তাকিয়ে দেখে আর লাভ কী? আলনায় হাত বাড়িয়ে গরদের একটা পাঞ্জাবি সে তুলে নিলে। ছেলেবেলায় ভাবতো চল্লিশ বছর বয়স হ'লেই আত্মহত্যা ক'রে মরবে। বার্ধক্য সম্বন্ধে একটা অসুস্থ আতঙ্ক ছিলো তার মনে। চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলে চিরুনি দিয়ে। যাক, তবু ভালো। আর এখন আমি ভাবছি এতদিনে আমার জীবন আরম্ভ হ'লো। বয়সটা কিছু নয়, সত্যি। চেহারাটা কিছু নয়। ভুঁড়ি আর পাক-ধরা চুলের মানেই এই নয় যে যৌবন ম'রে গেছে। কিন্তু তুমি যাকে বলছো অন্তরের যৌবন কেমন ক'রে জানো যে অন্যের চোখে সেটা ধরা পড়বেই?

কাপড়ে ঢাকা একটা ট্রে হাতে নিয়ে সন্ধ্যামণি ঘরে ঢুকলো।

—'আ, দাঁড়াও। এই টিপয়টা বারান্দায় নিয়ে যাই।'

সন্ধ্যামণি ট্রে-টা মেঝের উপর রেখে আট-কোণা বর্মি টিপয়টা বারান্দায় নিয়ে গেলো। বেশ চওড়া বারান্দা, দক্ষিণ-মুখো। হাওয়াটা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে, দূরে নারকেল গাছের মাথায় রোদ সোনালি।

'এসো,' ট্রে-টা নিয়ে গিয়ে সে ডাকলে।

অবিনাশ তার পরিত্যক্ত কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট-কেসটা বার ক'রে নিলে। ও, সেই চিঠিটা। সকালবেলা পূর্ণেন্দুবাবুর চিঠি: শোভনা কেমন আছে আমরা সবাই ভয়ানক উদ্বিগ্ন যদি সে একটু ভালো থাকে সন্ধ্যামণি

কি কয়েকদিনের জন্য একবার আসতে পারবে। কোন এক পাহাড়ে যেন তাঁরা আজকাল। কালিম্পং? না হাফলং? ভুলেই গিয়েছিলো চিঠিটার কথা, পকেটেই আছে। পকেটে সে আর-একবার হাত ঢোকালো, তারপর চিঠিটা হাতে ক'রে বারান্দায় ঢালু-পিঠ-ওলা ইজি-চেয়ারে গিয়ে বসলো।

'তোমার বাবার চিঠি,' চায়ে চুমুক দিয়ে অবিনাশ বললে।

'কী লিখেছেন?'

'প'ড়ে গ্যাখো।'

সন্ধ্যামণি চিঠিটা তুলে নিলো, পড়লো, তারপর আবার খামে ভ'রে রেখে দিলো।

অবিনাশ চোখ তুলে তাকালো।

'তোমার যাওয়া উচিত।'

সন্ধ্যামণি কিছু বললে না।

অবিনাশ আস্তে-আস্তে এক কামড় ব্রাউন-রুটি চিবিয়ে খেলো। —'তোমার বাবাকে লিখে দেবো যে তুমি শিগগিরই যাচ্ছো।'

'এখন কী ক'রে যাই?'

'এখনই তো যাবে,' অবিনাশ আস্তে-আস্তে বললো। 'পাহাড়ে গেলে শরীর ভালো হবে তোমার—সেইজন্যেই তো।'

'শরীর তো ভালোই আছে আমার।'

'পাহাড় দেখতে যাও তবে।'

'পাহাড় দেখবার আর কি সময় পাবো না?'

অবিনাশ নিঃশব্দে চুমুক দিলে পেয়ালায়।

'তুমি চা খাবে না?'

'এখন থাক।'

'তুমি কি না-খাওয়াও প্র্যাকটিস করছো নাকি আজকাল? যে-হারে এগোচ্ছো, আদর্শ হিন্দু নারী হ'য়ে উঠতে তোমার আর দেরি নেই।'

'দাঁড়াও তবে, আর-একটু গরম জল নিয়ে আসি।'

'না, থাক, তোমাকে কিছু করতে হবে না।'

অবিনাশ উঠে ঘরের ভিতর থেকে একটা কাচের গেলাস নিয়ে এলো। তাতে খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে বললে, 'বোসো।'

সন্ধ্যামণি একটা ক্যানভাসের ইজি-চেয়ার কাছে টেনে এনে বসলো।

'শোনো: তোমাকে যেতেই হবে। তোমার বাবার তা-ই ইচ্ছে। তুমি যদি না যাও, তিনি হয়তো মনে করবেন এ-বাড়ির গোলমালের জন্যই তোমার যাওয়া হ'লো না। সে-দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না; তোমাকে যেতেই হবে।'

'আমি বাবাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে লিখে দেবো।'

অবিনাশের হাতের পেয়ালাটা সশব্দে পিরিচের উপর নেমে এলো।

'তুমি ভাবছো কী বলো তো? তুমি না-থাকলে এখানকার কিছুই চলবে না, এ-ই তো? কিন্তু সবই চলবে, আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। নিজেকে তুমি যতটা অপরিহার্য মনে করো তা তুমি নও।'

সন্ধ্যামণি হাসলো।

'অন্তত, নিজেকে অপরিহার্য ভাবতে দোষ কী ?'

'আর এমন যদি হয় যে চলে না তবে না চললো। তাই ব'লে তুমি তোমার নিজের জীবন নষ্ট করবে নাকি ?'

'না, জীবন নষ্ট করবো কেন ?'

'নষ্ট হ'লেই বা কী—এই তো ভাবটা ? ক-টা লোকের জীবনে এমন সুযোগ আসে রুগ্ন ও দুর্বলকে ত্রাণ করবার ? বলো, মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ !'

অবিনাশ ঢক ক'রে অনেকখানি চা গিলে ফেললো। একটু পরে আবার বললো :

'চিরকালের মতো আমাদের কৃতজ্ঞতা তো রোজগার করেইছো। এতেও কি তুমি তৃপ্ত নও ?'

তবু সন্ধ্যামণি কিছু বললো না। আর হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ চোখ সরিয়ে নিলে।

'সত্যি তোমার শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। না-হয় কয়েকদিনের জন্যে গেলেই।'

সন্ধ্যামণি আস্তে-আস্তে চোখ তুলে তাকালো।

'শরীরটাকে সবচেয়ে বেশি আরামে রাখাই সব চেয়ে বেশি ভালো থাকা নয়।'

'শেষ পর্যন্ত এই তো হবে যে তুমিও অসুখে পড়বে !'

'তা কোনোকালে একটু অসুখ করতেও নেই নাকি ?'

অবিনাশ শরীরটাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি যদি এ-রকম করো তাহ'লে আর এখানে থাকা হবে না তোমার।'

সন্ধ্যামণি তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'তুমি যদি বলো তাহ'লে চ'লে যাবো।'

আর তারপর চুপচাপ। অবিনাশ ফিরে এসে চেয়ারটায় বসলো: তার খাওয়া তখনো অসম্পূর্ণ। আরো একটু চা সে ঢেলে নিলে। সমস্ত আকাশ ভ'রে বিকেল ছড়িয়ে পড়েছে। শাদা একটা মেঘ গুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে: লাল হ'য়ে উঠবে, তারপর যাবে মিলিয়ে। ততক্ষণে কলকাতার রাস্তাগুলো লোকে ভ'রে উঠবে, মেয়ে আর পুরুষ, হাসছে, চলছে, কথা বলছে। হাওয়ার লোভে, সুখের অন্বেষণে, হয়তো কিছু ভোলবার চেষ্টায়। সিনেমার দরজায়-দরজায় ভিড়। কাপড়ের দোকানের সামনা দিয়ে যেতে-যেতে কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে-থাকা মেয়েরা। কলেজের ছাত্র গল্প করছে বন্ধুর কাছে, কেমন ক'রে একজন মেয়ে। রাস্তা পার হবার জন্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। হলদে-আলো-জ্বালানো ট্র্যামের সামনের বেঞ্চিতে ব'সে বুড়ো ভদ্রলোক এক পয়সার সাপ্তাহিক পড়ছেন।

হঠাৎ সন্ধ্যামণি উঠে দাঁড়ালো।—'যাই, বৌদিকে দেখে আসি।'

চুপ ক'রে ব'সে রইলো অবিনাশ। আকাশে জ্বলছে সোনা। সন্ধ্যামণি উঠে যাবার সময় কাচের গেলাশটা তার বাবার চিঠির উপর রেখে গেছে। অবিনাশ চিঠিটা তুলে আনলো, শাদা খামের উপর বাদামি রঙের একটা দাগ। এই নতুন টিকিটগুলোর রং

ভারি সুন্দর। পিঙ্ক। তার ছেলেবেলাকার টুকটুকে লাল রঙের চার পয়সার টিকিট। ব্যবহার করার কোনো সুযোগ পেতো না, খামে লাগতো সবুজ রঙের দু-পয়সা। ভারি আপশোষ হ'তো। চিঠিটার একটা জবাব দিতে হবে। সন্ধ্যামণির পরীক্ষা সামনে, এ-সময়ে এখানেই থাকা ভালো। কিন্তু পরীক্ষা ও দেবে না। কী হবে এম. এ. পাশ ক'রে? আমাদের জীবনের উপর ডাকটিকিটের রঙের প্রভাব: এ নিয়ে কি কেউ ভেবেছে? আমি যদি ভারতবর্ষের রাজা হতাম, প্রতি মাসের টিকিটের রং বদলাতাম। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে একটা বিস্ময়। আজকালকার শুকনো জীবনে একটু আনন্দ, সরসতা। ভয়ংকর ব্যস্ত বড়ো সাহেব ভয়ংকর জরুরি চিঠি পড়বার আগে টিকিটটার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতেন। কাজের জাঁতার মধ্যে এক মুহূর্তের ফাঁক। তুমি যদি বলো তাহ'লে চ'লে যাবো। শোনো: তোমাকে যেতেই হবে। এখানে থেকে তুমি মরবে নাকি? পূর্ণেন্দুবাবু মনে-মনে কি ভাবছেন না জানি। হাজার হোক, তাঁরই তো মেয়ে। রুগ্ন বাড়ির থমথমে হাওয়ায় পচছে। কি এ-রকম করা যায় যে ঋতুর সঙ্গে-সঙ্গে রং বদলালো। বসন্তে কচি পাতার রং। দুপুরবেলায় পুকুরে ডুব দিলে জলের যে-রং। কি বিশেষ উৎসবের বিশেষ চিহ্ন। যেমন দোলের মাসে আবিরের রঙের টিকিট। জাতির প্রাণে সরসতা। সে জোর করছে না কেন? জোর ক'রে কিছু বলছে না কেন? আর পুজোর মাসে— শরতের কী রং? শুভ্র শরৎ। কিন্তু শরৎ সবুজ, আর শরৎ সোনালি। আর শরৎ নীল। রেলগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা উজ্জ্বল

সোনালি ছবি। আর মোটা-মোটা শাদা মেঘগুলো, অলস, আলোয় মাতাল। সেবার তারা ডিহিরিতে গিয়েছিলো। মাছরাঙা রঙের একটা শাড়ি সন্ধ্যামণি প্রায়ই পরতো। আর যে-পোড়া দেশে মাছ মেলে না, শোভা বলতো, সেখানেও মানুষ এসে থাকে! কিন্তু জল। জলের জন্যই তো। হ্যাঁ, জল খেয়েই থাকো আরকি!

শরতের জন্য উজ্জ্বল হলদে রং। রেলগাড়ির জানলা দিয়ে দেখা আশ্বিনের মাঠের মতো। দূরে একটা বনে একদিন তারা গিয়েছিলো চড়ুইভাতি করতে। ছোটো দল হয়েছিলো: সেই যে ছোকরা যে বলতো আমাকে আজ একটা পয়সা দেবেন, কাল দুটো পয়সা, পরশু চারটে, এমনি ক'রে ঠিক এক মাস: তারপর সমস্ত জীবন আর-কিছু আমি চাইবো না। ক-লক্ষ টাকা যেন হয়। গাছের ছায়ায় ব'সে Anthology of Second Best Poems পড়া। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে মাছরাঙা রঙের শাড়ি। না, না, জীবন নষ্ট হবে কেন? জীবন কি নষ্ট করবার? আর ওর জীবন নিয়ে ও কী করবে আমি তা ব'লে দেবার কে? তার রুমালটা হারিয়ে গিয়েছিলো। সমস্ত জীবনে কতগুলো রুমাল একজনের হারায়? কোথায় যায় সেগুলো? সেই মাছরাঙা-শাড়িটা কি আছে এখনো?

না, জীবন নষ্ট করবার নয়। আমাকে দাও আমার জীবন। বাঁচতে দাও আমাকে। কেবল অন্ন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো না। জড়িয়ে রেখো না আমাকে বস্তুতে, সঞ্চয়ে, উপকরণে। প্রতিদিনের এই রাশি-রাশি জ'মে-ওঠা। দিনের সঙ্গে দিনের

জোড়া-লাগানো এই অন্তহীন শৃঙ্খল। ছিঁড়ে ফেলো, ছাড়া দাও আমাকে ; আমার দিনগুলো ফুটে উঠুক ফুলের মতো, ঝ'রে পড়ুক। আজকের এই দিনকে মরতে দাও, মরতে দাও। তাকে টেনে এনো না, জোর ক'রে তাকে মনে রাখতে যেয়ো না। আর আমি বেরিয়ে আসবো আকাশের নিচে, নগ্ন আর মুক্ত আর স্পন্দমান। তোমার কাছে, ঈশ্বর।

অবিনাশ চেয়ারে হেলান দিলে। আকাশে সোনা। নারকেল গাছের আড়ালে আগুনের স্রোত। গুঁড়ো-গুঁড়ো সোনালি আলো বাতাসে ভাসছে। এর মধ্যে ব'সে থাকতে ভালো, ব'সে-ব'সে ভাবতে ভালো। ছায়া পড়েছে রাস্তায়, ছোটো-ছোটো হলদে ফুলে ভরা ঐ গাছটা খামকা খুশিতে কেবলই মাথা ঝাঁকাচ্ছে যেন। কী ফুল ? আশ্চর্য আজকালকার এই বিকেলগুলো। আরো আশ্চর্য রাত। ফুল সে চেনে না কোনোকালেও। চিনি, চিনি। আর-কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয়। আমি তোমাকে দেখেছি, আমি তোমাকে চিনি। তুমি যে-ই হও, আমাকে আর ছাড়াতে পারবে না।

সময়ের লুকোনো কোণ থেকে হঠাৎ যেন একটা আগুনের সাপ ফণা তুলে উঠেছে। যদি সে একটু চুপ ক'রে থাকে, তাকে মারতে আসে। এতদিন তা কি মিশে ছিলো তারই রক্তে ? আর সে ভেবেছিলো জীবনে আর-কিছু নেই, আর-কিছু নেই ; এখন শুধু দিনের পর দিন টেনে চলা, সময়ের বুকে লেগে দীর্ঘ শৃঙ্খল উঠছে বেজে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, সময়ের বুকের

উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে: কিছু করবার নেই, কিছু ভাববার নেই।

জীবন তো এমনি, গড়পড়তা মানুষের জীবন তো এমনি। এর বেশি সে চাইবে কেন? সে তো একে মেনেই নিয়েছিলো। তার জীবনকে নিয়েছিলো অন্যের হাত থেকে, প্রশ্ন করেনি। তার সেই অল্প বয়সের বিয়ে। কেন? বাবা খুশি হবেন সেই জন্যে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কিছু এসে যায় না। এই যে আমাদের নিজের ইচ্ছায় বাঁচতে চাওয়া, এটা সম্পূর্ণ আধুনিক একটা ব্যাধি। আমার জীবনের উপর আমার অধিকার। তুমি ভুল করবে না কী ক'রে জানো? আমরা হিন্দুরা চেয়েছিলুম শান্তি। আনন্দের ইন্দ্রধনু নয়, হতাশার দুঃস্বপ্ন নয়। মসৃণ, সমতল, একটানা শান্তি। জীবনের শক্তিগুলোকে অন্য কাজের জন্য রাখো। দুঃসহ আবেগের আলোড়নেই যদি ক্ষয় ক'রে দাও তবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন জীবন-স্মৃতিতে ইংরিজি সাহিত্যের ঝোড়ো আবেগ আমাদের বেড়া-ঘেরা জীবনে মানায় না। উন্মত্ততা: লিয়রের, ওথেলোর, রোমিওর। আমাদের জীবন অগভীর, হয়তো নিচের পাঁক ঘুলিয়ে উঠবে। আমরা বেঁধে নিয়েছিলুম জীবনকে শক্ত ক'রে, পারিবারিক, সামাজিক দাবির দড়াদড়িতে। আমার জীবন আমার একলার নয়। আমি কী করি কি না-করি অনেকগুলো জীবনে তার ঘাত-প্রতিঘাত। তাদেরই মধ্যে তোমার জন্ম, তোমার লালন; তোমার জীবনের স্রোত মেশাবে তাদের মধ্যে। আমাদের বিবাহ একজনের—মানে দু-জনের—খুশির জন্য হয়, পারিবারিক একটা

অনুষ্ঠান। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটাই মহত্তম নয়: বিস্তৃত পরিবারের মধ্যে অনেক নতুন সম্পর্কের জটিলতা থেকে নিখুঁত একটা সামঞ্জস্যের উদ্ভব। নির্দিষ্ট ছক-কাটা গণ্ডি, বিপদ আসবে কোন্‌খান দিয়ে? মন্ত্র-পড়া গণ্ডি, তার বাইরে যেয়ো না। তার বাইরে হয়তো ছদ্মবেশী রাবণ, মন-ভোলানো সর্বনাশ। ছাখো, এখানে সন্ধ্যাবেলায় ধূপের ধোঁয়া উঠছে, প্রদীপ জ্বলেছে তুলসীতলায় ...গল্পগুচ্ছ থেকে ছবিটা সম্পূর্ণ ক'রে নিয়ো। এখানে নিশ্চিন্ত মঙ্গলের স্থৈর্য। কিন্তু একবার, একবারের জন্য সেই উন্মত্ততা, সেই অপরূপ সর্বনাশ! রোমিওর উন্মত্ততা। Wert thou as far as the vast shore washed with the furthest sea, I would adventure for such merchandise. শেষে তার মৃত্যু। একবার এমনি ক'রে আমাকে মরতে দাও, একবার।

And they lived happily ever afterwards. Oh, they did. শোভার জন্য তার স্ত্রী-নামের গৌরব। তার গৌরব, অলংকার। তাকে ধারণ করো, যেখানে সবাই দেখতে পারে, মুগ্ধ হ'তে পারে দেখে। স্ত্রী। ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধি—মস্ত লোক তার স্বামী; স্বামীর নামের সঙ্গে, যশের সঙ্গে, কীর্তির সঙ্গে তার বিবাহ। মেয়েদের আর কী চাইবার থাকতে পারে? সমাজে তার প্রতিষ্ঠা, যথেচ্ছ খরচ করতে পারার স্বাধীনতা, প্রতিফলিত গৌরবের আলো তার মুখে। জ্বলছে অলংকারের আলো। ভুল করবার উপায় নেই। স্বামী তো তারই, স্বামীর সমস্ত জীবন তার। ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং।

তোমার জীবন আমার হোক, আমার জীবন তোমার হোক, দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে। বিয়েতে এই পদ্য ছাপিয়ে বিলি করবার ফ্যাশান আর কতকাল চলবে না জানি। এখনো মাঝে-মাঝে দেখা যায়। তার বিয়েতে জাপানি কাগজের উপর বেগনি কালিতে ছাপা···শোভার ভাই-বোনেরা।

দয়াময় জগদীশ
এ-মিনতি তব পায়,
রেখো চিরকাল সুখে
অবিনাশ-শোভনায়।

মিনতি শুনেছিলেন দয়াময়। একটা খোঁচ ছিলো না তাদের জীবনে। সে পয়সা রোজগার করেছে, শোভার মান বাড়িয়েছে। আর প্রতিদিন শোভা করেছে তার গৃহ নির্মাণ। কেউ ছিলো না তাকে ঘাঁটাতে আসতে পারে। আর-কী চাইতে পারে একজন মেয়ে? আর সে—সে রয়েছে তার মন নিয়ে তার বইয়ের জগতে আলাদা। তবু, শোভার পরিমণ্ডলের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। তার নিশ্বাসের বাতাস পর্যন্ত শোভার রচনা। তার উপর শোভার সম্পূর্ণ দখল; সে চালনা করছে তার সমস্ত জীবন, অদৃশ্যে, অজ্ঞাতে। এমন একটা অভ্যেস যা ঘুম পাড়ায়। তা কাটিয়ে ওঠার শক্তি আছে কোন্ পুরুষের? পৃথিবীর সবচেয়ে তেজস্বী যে-পুরুষ, সে-ও খানিক ছটফট ক'রে আস্তে-আস্তে শান্ত হ'য়ে যাবে।

কাটিয়ে ওঠবার ইচ্ছাও থাকে না কিছুকাল পরে। বেশ, এ-ই তো বেশ। মেয়েদের অদ্ভুত সম্মোহন-শক্তি। ইস্পাতে তৈরি ইচ্ছা। কেমন অলক্ষিতে সাঁড়াশির মত শুঁড়গুলো ছড়িয়ে পড়ে, আঁকড়ে ধরে; টেরও পাওয়া যায় না। আরাম লাগে বরং। ইস্পাতের ইচ্ছা, সমস্ত জীবন ভ'রে হানা দিচ্ছে, মুহূর্তের জন্য শিথিল হবে না মুঠি। মা-র মন যেমন ছেলেকে অনুসরণ করে—তার কাজে, তার প্রমোদে, তার বহির্জীবনের সমস্ত লীলায়। মা-র চোখ যেমন অন্ধকারে জেগে থাকে, ছেলে যখন বন্ধুদের আড্ডায় ব'সে হাঁটু চাপড়ে হেসে উঠছে। ছেলের জীবন কত বেড়ে গেছে, মা আর নাগাল পান না: তবু চেষ্টা, অন্ধ, নির্মম চেষ্টা ছেলেকে ধ'রে রাখতে, নিজের মধ্যে রাখতে। মাতৃশক্তি; স্ত্রী-শক্তি। নির্মম, ভয়ংকর স্ত্রী-শক্তি, কোনোখানেই তা থামবে না। আর ঈশ্বর শোভাকে কোনো সন্তান দেননি। তার স্ত্রী-শক্তির সমস্ত ব্যগ্রতা দিয়ে স্বামীকে সে আঁকড়ে ধরেছিলো; তার মাতৃ-সত্তার অন্ধ প্রবৃত্তি দিয়ে স্বামীকে ভ'রে রাখতে চেয়েছিলো নিজের মধ্যে। তোমার জীবন আমার হোক, আমার জীবন তোমার হোক।

—কিন্তু একজনের জীবন আর-একজনের কেন হবে? আমার জীবন কি একটা সম্পত্তি যে আমি আর-একজনকে শীলমোহর-করা চুক্তিপত্রে তা দিতে পারি? শুধু বিবাহ যথেষ্ট নয়, বিবাহ পর্যন্ত যথেষ্ট নয়। এমন-কিছু আছে বিবাহের অঙ্গীকারেও যা দেয়া যায় না। আমার যা-কিছু সব নাও; সমস্ত কথা আর কাজ; যা-কিছু আমি করি, যতকিছু আমার পরিচয়—

কিন্তু আমার জীবন হোক আমারই। সেখানে তুমি কিছু খুঁজে পাবে না: সেখানে আমি নামহীন, অননুসরণীয়। আমার জীবন আমার হোক, এর চেয়ে বড়ো প্রার্থনা আর কী হ'তে পারে।

এতদিন সে লক্ষ্য করেনি, এতদিন সে হ'তে দিয়েছে, মেনে নিয়েছে। আজ ভাঙলো ঘুম। আর আজ সমস্ত জীবন যেন তার বুকের উপর ভেঙে পড়তে চাইছে। যে-খোলসের মধ্যে এতদিন সে অন্ধ আরামে কাটিয়ে এসেছে তা ভাঙলো বুঝি। হয়তো এতদিনে আসবে তার মুক্তি। আজ এতদিন পরে সে কি তার জীবনকে নিতে পারে না? যেখানে ঝরনা গড়িয়ে চলে পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে উচ্চহাসির শব্দ ছড়িয়ে, বনের সবুজের ফাঁকে চিতাবাঘ ঝলমল ক'রে ওঠে, যেখানে মুক্তি, যেখানে দীপ্তি, যেখানে রক্তের মধ্যে সূর্যের স্পন্দন। অনেক, অনেকদিন সে কাটিয়েছে দেয়ালের ছায়ায়: আজ সমস্ত আকাশ তার সমস্ত বিদ্যুৎ নিয়ে ঘিরে আসুক না; তুলে উঠুক অন্ধকারের বন্যা, লুপ্ত ক'রে দিক এই পুরোনো পরিচিত জীবনের শেষ সীমান্তরেখা।

আকাশে ঘোর লেগেছে। লাল একটা মেঘ: যেন ডানা-ছড়ানো পাখি, এখনি উড়ে চ'লে যাবে। রঙিন গোধূলি ভ'রে উতরোল হাওয়া। দক্ষিণ থেকে আসছে এই হাওয়া, সমুদ্র থেকে, বঙ্গোপসাগর থেকে, হাজার মাইলের লোনা জল পার হ'য়ে। কলকাতাতেই এই ঝড়: সমুদ্র না জানি আজ কেমন। অবিনাশ চোখ বুজলো, আর দেখলো তার চোখের সামনে কেশর-ছড়ানো

সিংহের মত ঢেউগুলো লাফিয়ে পড়ছে। রাত্রে ভয় করে। আর এমনি আমরা ভয় করি—আমাদের রক্তের জোয়ারের আতংক আর রহস্যকে ভয় করি। না, না: that way madness lies. উন্মত্ততা নয়: লিয়রের, ওথেলোর, রোমিওর। কিন্তু জীবন কি শুধু বহন করবার, শুধু চুপ ক'রে সহ্য করবার? রক্তের মধ্যে যখন সূর্য জ্বলে ওঠে তখন কি লজ্জায় মুখ ঢাকবো? ভয়ে কি মুখ ফেরাবো তখন, স'রে যাবো, লুকিয়ে থাকবো নিজের অবরোধে—

কিন্তু সে-কথা যে বলবার নয়; নিজের মনে-মনেও বলবার নয়। গভীর রাত্রে রুদ্ধ ঘরে একা ব'সেও তা উচ্চারণ করা যায় না। O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo? কিন্তু সমস্ত অতীত কি মুছে যেতে পারে না এই অন্ধকারের বন্যায়? ভুলতে কি পারবো না, কী ছিলো, কী আমরা ছিলাম? ভাগ্যের দাসত্ব আর তো নয়: ভাগ্যের সোনার হাতে আজ মুক্তির অঞ্জলি। এই মহার্ঘ উপঢৌকন উপেক্ষা করবো কেমন ক'রে? এই ভীরুতার পাপ কি আমাদের ব্যর্থতার প্রেত-মুখের উপর চীৎকার ক'রে উঠবে না? অতীত কি এসে দাঁড়াবে এই এই পরিপূর্ণতার মাঝখানে, অতীতের মৃত বছরগুলোর অদ্ভুত ছায়ায় সব ঘোলাটে হ'য়ে উঠবে? কিন্তু যা ছিলো তা তো আর নেই: নতুন কী জন্ম নিয়েছে দেখছো না—আকাশে বিদ্যুৎ, বজ্র থিতিয়ে আছে বাতাসে। বিদ্যুৎ হানা দিচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে, লাল বিদ্যুৎ, ভীষণ লাল সাপ, আকাশকে যে পুরোনো কাপড়ের মত ফেঁড়ে

দেয়। এতদিন ছিলো শূন্যতা, শূন্যতার বিবর্ণ মৃত্যু: আজ ঝিলিমিলি জ্বলছে রক্তের প্রতি বুদ্বুদে আশ্চর্য রামধনু। পরিপূর্ণতার অপরূপ জ্যোতির্ময় মূর্তি বুকের দরজায় ঘা দিয়ে বলছে, 'খোলো।' আর তার গায়ে কি আমরা ছুঁড়ে ফেলবো অতীতের ফ্যাকাশে চাদর, মৃত্যুর মতো যার গন্ধ? চাপা দিয়ে রাখবো প্রাণপণে—রুদ্ধস্বরেও উচ্চারণ করতে পারবো না তার নাম?

Bondage is hoarse, and may not speak aloud,
Else would I tear the cave where Echo lies,
And make her airy tongue more hoarse than mine
With repetition of my Romeo's name.

আমি চীৎকার করবো তার নাম শহরের পথে-পথে, তারার বুকে লাগবে তার প্রতিধ্বনি। তোমার নাম। তোমার নাম আমি বলবো। তোমার নামের শব্দে হাজার প্রতিধ্বনি তুলবো জাগিয়ে। কিন্তু আমার গলার উপর অতীতের ঠাণ্ডা আঙুল। O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? আমি যদি আমি না-হতাম, তুমি যদি। সত্যকে জড়িয়েছে আমাদের নামের কুয়াশা। সেই অন্ধকারে ডুব দাও, যেখানে মুছে গেছে আমাদের নাম আর পরিচয়, জীবনের কোন পরিচিত সীমা থেকে এসেছিলাম, ঘটনার যত স্মরণ-চিহ্ন আঁকা হ'য়ে গিয়েছিলো:

যেখানে অপরিসীম অন্ধকারে কেবল তুমি আর আমি: তুমি আর আমি, নামহীন, বন্ধনহীন, চিরন্তন।

ছায়া ঘনালো, রাস্তায় গ্যাসের সবুজ চোখ। এখানে নামলো সন্ধ্যা, সূর্যদেব কোন। অস্ট্রেলিয়া? না দক্ষিণ আমেরিকা? হয়তো প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো ঘন-নীল জলের উপর এখন সূর্য উঠছে। নীল জল আগুনের মতো জ্ব'লে উঠলো। আগুন ধরলো কোনো ঘুমোনো দ্বীপের পামগাছের পাতায়। কোনো ছোটো দ্বীপ: চিরকালের নীল জলরাশি তাকে আদর করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে কোনো অসভ্য বালকের মুখের উপর রোদ এসে পড়লো। জেগে উঠে সে হাত দুটো উপরে তুলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙছে: ফুলে উঠছে তার উল্কি-আঁকা বুক।

বুয়োনো মুনো রন্নি, বুয়োনো মুনো রন্নি,
হিয়োথালিয়ো, হিয়োথালিয়ো, হিয়োথালিয়ো।

সেই বন্য শূকর মরুক, সেই বন্য শূকর মরুক, হে দেবতা হিয়োথালিয়ো।

ছায়ার মতো নিঃশব্দে সন্ধ্যামণি এসে দাঁড়ালো। তাকে ঠিক দেখতে পাবার আগেই অবিনাশ তা বুঝতে পারলে: মৃদু একটা ধাক্কা যেন লাগলো তার বুকে।

—'বৌদির জ্বরটা আজ আবার একটু বেড়েছে।'

'বেড়েছে?'

'কর্নেল গাঙ্গুলিকে খবর দেবে নাকি একটা ?'

'কেন আর বেচারাকে কষ্ট দেয়া ?'

'কর্নেল গাঙ্গুলি বলেছিলেন—'

অবিনাশ একটা সিগারেট বের করলো কেস্ থেকে। দেশলাই জ্বালার শব্দ হ'লো। 'কর্নেল গাঙ্গুলি এসেই বা কী করবেন ?' ঝলসে উঠলো হলদে আলো, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিবে গেলো। 'আর কী করতে পারেন তিনি ?' দু-হাতে আড়াল ক'রে অবিনাশ সিগারেট ধরালে। ধূসর একটা ধোঁয়ার সাপ তার লোহা-রঙের চুলে পেঁচিয়ে গেলো। 'খুব খারাপ কিছু নয় তো ?'

'কত আর খারাপ হবে,' সন্ধ্যামণি বললে।

'একটা টেলিফোন ক'রে রেখো ডাক্তারকে—না, কাল সকালে তো তাঁর আসবারই কথা ?'

'ঠিক হবে সব, তুমি ভেবো না কিছু।'

'না, ভাবনার কী আছে ?'

চুপ ক'রে রইলো সন্ধ্যামণি। তার কালো চুল পিঠের উপর লম্বা হ'য়ে পড়েছে। তার কালো চুল ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যায় মিশে যাচ্ছে।

অবিনাশ তার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো।

'ফর্শা একটা শাড়ি পরলেও দোষ হয় নাকি ?'

সন্ধ্যামণি তার আঁচলটা হাতে তুলে দেখলে একটু।—'কেন, এটাতে দোষ কী ?'

'তুমি কি এতই ব্যস্ত যে বিকেলবেলায় একবার কাপড় ছাড়বারও সময় হয় না তোমার?'

সন্ধ্যামণি নিচু গলায় একটু হেসে উঠলো।—'মনে থাকে না রাজ।'

'তুমি যে কী ভয়ানক কাজের লোক সেটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারো না কেন? এত রকম ক'রে তার বিজ্ঞাপন দিতে হয়!'

সন্ধ্যামণি কিছু বললো না।

'অন্যের সেবার চাইতে নিজেকে যে কষ্ট দিচ্ছো এই তৃপ্তিই তোমার বড়ো।'

'উঃ! একবেলা একটু ময়লা কাপড় প'রে থাকা কী ভয়ানক কষ্ট।'

'কিন্তু তা-ই বা থাকবে কেন তুমি? কী বিশ্রী দেখায়।'

'না-হয় দেখালোই।'

'না, দেখাতে পারবে না। এটা তো সহজে আসে না তোমার মধ্যে, এর পিছনে আছে প্রবল বাহাদুরির ভাব।'

হঠাৎ সন্ধ্যামণি মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'বার-বার ও-কথা কেন বলছো? বাহাদুরি কার কাছে নেবো?'

'নিজেরই কাছে! নিজেকেই নিজে হাত-তালি দেবার সুখ— তার নামই তো দম্ভ।'

'অতবার বলছো কেন এক কথা? তুমি কি আমার মনে কষ্ট দিতে চাও?'

অবিনাশ উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি যাও ঃ এক্ষুনি হাত-মুখ ধুয়ে ভালো একটা শাড়ি প'রে পরিষ্কার হ'য়ে এসো গে।'

'যাচ্ছি।'

'এখনই যাও। আমার সঙ্গে বেরোতে হবে তোমাকে।'

'বেরোতে হবে? কোথায়?'

'একটু ঘুরে আসবে গাড়িতে।'

'তুমি রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখতে গেলে না?'

'কোথায় আর তুমি যেতে দিলে।'

'আমি যেতে দিলাম না বুঝি?'

'আর কথা বোলো না, যাও।'

'তুমি নাটক দেখতে গেলেই পারতে। এতক্ষণ এখানে ব'সে-ব'সে করলে কী?'

অবিনাশ সিগারেট-কেস্‌টা একবার খুলে ঠাশ ক'রে আবার বন্ধ করলো।

'কেন দেরি করছো? শুনতে পাও না কথা?'

'এমন অমানুষিক তাড়াই বা কিসের?'

'শিগগির আবার ফিরতে হবে তো। এই খানিকটা ঘুরে আসবো ময়দানে, চলো। এর মধ্যে তোমার বৌদির কিছু হবে না।'

সন্ধ্যামণি বললে, 'ভ্যাখো কাণ্ড! চায়ের বাসনগুলো তখন থেকে প'ড়েই আছে।'

সেই পাৎলা অন্ধকারে, অবিনাশ তার দৃষ্টি দিয়ে সন্ধ্যামণির চোখের নাগাল পাবার চেষ্টা করলে।—'ওগুলো থাক এখন। তুমি চট ক'রে কাপড় প'রে এসো, আমি গাড়িটা বার করি গিয়ে।'

সন্ধ্যামণি মাথা নিচু ক'রে ট্রের উপর বাসনগুলো সাজাতে লাগলো।

অবিনাশ তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

'তুমি যাবে না? যাবে না?' অদ্ভুত চাপা গলায় সে বললো।

পিঠ সোজা ক'রে তার দিকে তাকালো সন্ধ্যামণি।—'তুমি কি কিছু বোঝো না?'

কিন্তু অবিনাশ মুখ ফিরিয়ে নিলো।—'বোঝবার কী আছে এতে? তোমার ইচ্ছে নেই সে-কথা বলো না!'

'যাকে সুখী করার ক্ষমতা আমাদের নেই,' সন্ধ্যামণি বললে, 'তাকে দুঃখ অন্তত যেন না দিই।'

'তোমার বৌদির কথা বলছো?' একটু চেষ্টা ক'রে বললো অবিনাশ। সেই সন্ধ্যার আবছায়ায় কথাটা কেমন স্থূল শোনালো। তবু—কোনো আড়াল রেখে লাভ নেই; মনের মধ্যে চাপা ধোঁয়া জমতে দিয়ে লাভ নেই। স্পষ্ট হওয়াই ভালো: যদি দরকার হয়ই, একটু রূঢ় হওয়াই ভালো। তাই সে আবার বললো, 'তুমি একটু বেড়াতে গেলেই তোমার বৌদি মনে কষ্ট পাবেন তা অবিশ্যি আমার মনে হয়নি।'

'কিন্তু তুমি যাও না। নাটক দেখতেই যাও না-হয়। এখনো খুব বেশি দেরি হ'য়ে যায়নি হয়-তো।'

সন্ধ্যামণির কথাটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে অবিনাশ বললো, 'বেশ, না গেলে। ভালো একটা শাড়ি অন্তত প'রে এসো। তোমার এই অগোছালো চেহারার দিকে তাকানো যায় না।'

'তোমার আবার এত কাপড়চোপড়ে নজর! কার্লাইলের মতো বিশ্রী পোশাক সারা লণ্ডনে নাকি কারো ছিলো না: আর তিনিই লিখেছিলেন পোশাক সম্বন্ধে বিরাট বই!'

অবিনাশ বারান্দায় পাইচারি করলো একটু।—'তোমাকে ব'লে রাখছি, তোমার এ-রকম চেহারা আর যেন কখনো আমাকে দেখতে না হয়।'

'তুমি যা বলবে আমাকে তা করতেই হবে?'—সন্ধ্যামণি ট্রে হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

খানিক পরে ফিরে এলো। বিশেষ-কিছু করেনি। শাদা একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে, চুলটা এলোখোঁপা ক'রে জড়ানো। একটা সূক্ষ্ম সৌরভ ভাঙা-ভাঙা ঘুমের মতো থেকে-থেকে চমকে উঠছে তার শরীর থেকে।

'ঠিক হয়েছে?'

অবিনাশ চুপ ক'রে একটু তাকিয়ে রইলো।—'রঙিন শাড়ি পরলে না কেন?'

সন্ধ্যামণি হেসে উঠলো চাপা গলায়।

'চলো এবার। চলো। আমি বলছি, তোমাকে যেতেই হবে।'

সন্ধ্যামণি অবাক হ'য়ে অবিনাশের মুখের দিকে তাকালো।

'তুমি যা-কিছু বলবে সব আমি জানি। ও-সব কথার কোনো মানে হয় না। যশোদাকে ব'লে দিচ্ছি শোভার কাছে একটু বসুক। তুমি কি সত্যি ক'রে বলবে এমনি রোগীর ঘরে ব'সে সন্ধ্যা কাটাতেই তোমার ভালো লাগে?'

'ভালো লাগে কি না লাগে তার তো কথা নয়।'

অবিনাশ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত তুলে বললো: 'থাক, থাক, তোমার ও-সব কথা অনেক শুনেছি। তোমার অনেক বাড়াবাড়ি সহ্য করেছি, আর করবো না। এটা তুমি জেনো যে তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। এসো।' সন্ধ্যামণির হাত ধ'রে টান দিলো সে।

কিছু না-ব'লে সন্ধ্যামণি আস্তে-আস্তে অবিনাশের সঙ্গে, যেতে লাগলো। দরজার কাছেই যশোদা। সে একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে বললো: 'দিদিমণি, মাইজী তোমাকে ডাকছে।'

'মাইজীকে বলো দিদিমণি একটু পরে আসছেন,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলো অবিনাশ।

কিন্তু তার কথাটা চাপা দিয়ে সন্ধ্যামণি ব'লে উঠলো: 'থাক, কিছু বলতে হবে না। যাচ্ছি আমি।'

অবিনাশ নিচু গলায় বললে, 'দেখে এসো তাহ'লে। বেশি দেরি কোরো না, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

আবার সেই ইজি-চেয়ারটায় এসে বসলো। রাত বাড়লো, গ্রীষ্মের পরিষ্কার আকাশ তারায় ভ'রে গেলো: সন্ধ্যামণি আর এলো না।

অবিনাশের দাঁতের চাপে মুরগির নরম হাড় মুড়মুড় ক'রে ভেঙে গেলো। ঘাড় কাৎ ক'রে আধ-বোজা চোখে সে চিবোতে লাগলো, কুকুরের মতো। মজ্জাটা বা'র ক'রে আনতে হয়—নয় তো খেলে কী? মাংস খেতে হয় কুকুরের মতো ক'রে। অনেকে আছে, ইঁদুরের মত সামনের দাঁত দিয়ে কুটকুট ক'রে মাংস চিবোয়। গা জ্বালা করে দেখে। আ! মুরগির হাড়ের প্রতি দুর্বলতা তার চিরকালের। জানে, কেমন ক'রে খেতে হয়।

সন্ধ্যামণি তার খালি থালার উপর আঙুল দিয়ে কয়েকটা দাগ কাটলো।

'তুমি কি আমার উপর এতই রাগ করেছো যে একটা কথাও বলবে না?'

হাড়ের গুঁড়ো-গুঁড়ো ছিবড়ে বের ক'রে এনে অবিনাশ পাশের ছোটো থালায় জড়ো করলো।—'তোমার হয়েছে? ওঠো তাহ'লে।'

সন্ধ্যামণি থালার উপর একটা গুণন-চিহ্ন আঁকলো।—'বসি না একটু। যোশী, আর-একটু মাংস দাও বাবুকে।'

একটা মাংসের টুকরো আঙুল দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলো অবিনাশ।—'তোমার বৌদি কেমন আছেন এখন?'

'এই তো ঘুমোলেন একটু। সন্ধেবেলাটায় এমন ছটফট করছিলেন। তাঁর কাছে না-থাকলে চলতো কী ক'রে?'

'সে তো ঠিক কথা।'

সন্ধ্যামণি দু-দিকে আরো দুটো দাগ এঁকে একটা ছাপার অক্ষরের তারা তৈরি করলো। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবোনি যে আমি ইচ্ছে ক'রে—' কথাটা সে অসমাপ্ত রাখলে।

অবিনাশ কথা না-ব'লে মাংসচর্বণে নিযুক্ত হ'লো।

'এখনো কি তুমি রাগ ক'রে আছো?' সন্ধ্যামণির মুখ একটু ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

অবিনাশ চোখ তুলে তাকালো। দেয়ালের উপর ইলেকট্রিক পাখার ঘূর্ণ্যমান ছায়া। চিকচিক করছে সন্ধ্যামণির কালো চুল। তার গালে আজ অনেকদিন পর একটা লালচে আভা। আর হঠাৎ অবিনাশের মনে পড়লো বিলেত থেকে ফিরে এসে সেই প্রথম সন্ধ্যামণিকে দেখেছিলো। উষ্ণ লাল রক্ত যেন চামড়ার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, এমনি রং। টলটলে তরল চোখ, প্রাণের আলোয় টলোমলো। মাঝে-মাঝে খামকা সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, হাত দিয়ে মুখ ঢাকছে: যেন হঠাৎ অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে নিজের সৌন্দর্য। কী ভালো তার লেগেছিলো, কী খুশি সে হয়েছিলো ওকে দেখে। এ যেন ফুলের উন্মীলনের মতো, উজ্জ্বল চিতাবাঘের লাফিয়ে ওঠার মতো। কোনো আশ্বাস যেন, ঈশ্বরের

আশ্বাস। জীবনের নিছক আনন্দ; সেই আনন্দের ভিতর দিয়েই সার্থকতা। এমন-কিছু, যা আমাদের মানুষের জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব আর জটিলতা ছড়িয়ে যায়; যা সহজ, শুদ্ধ, চিরন্তন; সমস্ত প্রশ্নের যেখানে অবসান। আর তার মনে হয়েছিলো যেন তার বুকে উষ্ণ একটা অনুভূতি এসে লাগলো, জীবনের সবুজ উষ্ণতা, চিরকাল লালন করবার, বাঁচিয়ে রাখবার, ভালোবাসবার। আর-কেউ সে-ঐশ্বর্য তাকে দিতে পারতো না। আর এমন কৃতজ্ঞ সে বোধ করেছিলো, ঐ মেয়ের কাছে—এই ঐশ্বর্যের জন্য, ঈশ্বরের এই আশ্বাস, লাফিয়ে-পড়া ঝরনার আর লাফিয়ে-ওঠা চিতাবাঘের অনির্বচনীয়তা! আর আজ কি তা একেবারে হারিয়ে গেছে, সন্ধ্যামণির মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে, আজ কি তাকে আর ফিরে পাবো না?

'মণি!' ডাক দিলো অবিনাশ।

'কিছু বলবে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অবিনাশ বললো, 'আমি কি তোমাকে ধ'রে রাখছি এখানে?'

সন্ধ্যামণি তার থালার উপর তারার চারদিকে একটা বৃত্ত এঁকে বললে: 'ধ'রে রাখতে যে পারছো সেটা কেন ভাবো না?'

'হঠাৎ আমার মনে হ'লো তুমি যে তোমার বাবার কাছে যেতে চাইলে না এতে আমি খুশিই হয়েছি। আর খুশি হয়েছি ব'লে খারাপ লাগছে আমার।'

'আমাকে তুমি চ'লে যেতে বোলো না, আমাকে তুমি

তোমার কাছে থাকতে দিয়ো,' ব'লে সন্ধ্যামণি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো।

খাওয়ার পরে অবিনাশ নিজের হাতে একটা পাটি আর বালিশ নিয়ে চ'লে এলো ছাদে। সন্ধ্যামণি গেছে রোগীর ঘরে: ভালোই। এই সময়ে তার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা করছিলো একা থাকতে। জীবনের বেশির ভাগ তার একা-একা কেটেছে, সত্যি বলতে। মানুষের-সঙ্গে-মানুষের নিবিড় যোগাযোগের ফসল ফলেনি তার জীবনে। নিজেকে নিজের বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। আর তাই, অন্যের সংস্পর্শে একটু অস্বস্তির ভাব তার কাটেনি এখনো। যে-সংস্পর্শ সে কামনা করে তা থেকেও হঠাৎ কেমন স'রে আসতে চায়। একা-একা তার অদ্ভুত রকমের ভালো লাগা; নিজের সঙ্গে দীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন আলাপের খানিকটা মস্তিষ্কপ্রসূত আনন্দ।

তারই ভারে তো আমি ম'রে যাচ্ছি, অবিনাশ মনে-মনে বললে, আমরা আধুনিকরা তারই ভারে তো ম'রে যাচ্ছি। নিজের সঙ্গে নিজের সঙ্গম: নিজের মধ্যে নিজের সৃষ্টি। মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম চাকার দ্রুত ঘূর্ণনের তালে-তালে অন্তহীন আত্ম-প্রসারণ। চেতনার অন্তহীন সুতো টেনে-টেনে বার-করা। বিশাল অদৃশ্য এই জালে আকাশের মুখ ঢাকা পড়লো। আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই, ঈশ্বরের চিরন্তন শান্তির মতো অপরূপ নীলস্রোতকে তো দেখিনে: আমরা দেখি অতিকায় একটা আয়না, আমি যেখানে লক্ষগুণে

বর্ধিত হ'য়ে প্রতিফলিত। চিৎ হ'য়ে শুয়ে সে আকাশের দিকে তাকালো। চাঁদ ওঠেনি : উত্তরের আকাশে সপ্তর্ষি বাঁকা হ'য়ে ঝুলে পড়েছে। এখানে-ওখানে শাদা মেঘ জড়িয়ে আছে, ঘুমে-ভরা চোখে সমস্ত দিনের বিচ্ছিন্ন ছবির মতো অস্পষ্ট। কী মস্ত, কী অদ্ভুত দেখায় আকাশটা, চিৎ হ'য়ে শুলে। এখন আর আমাদের পৃথিবীর জীবনের নিশ্চল, নিঃশব্দ একটা পটভূমিকা মাত্র নয় : আকাশ বড়ো হ'য়ে ওঠে, তারায়-তারায় জ্বলন্ত নিশ্বাস ফেলে ; উত্তপ্ত, অন্ধকার স্রোতে যেন ঝ'রে পড়ে আমাদের বুকের উপর। কিন্তু পাথরের বুকের উপর তা ঝ'রে পড়ে, যে-হৃদয় আত্মচেতনার চাপে পাথর হ'য়ে গেছে। আমরা ভেসে যাবো না আকাশের স্রোতে, পাছে নিজেকে হারাতে হয়। এই অন্ধকারকে পর্যন্ত নিজের মনের আঁচড় কেটে-কেটে আমরা কলঙ্কিত করবো : নিজেকে হারাবো না।

মুক্তি দাও, আত্মচেতনার এই পাষাণ-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি দাও আমাকে। জানবার আর বোঝবার আর তর্ক করার আর যুদ্ধ করার এই সর্বনেশে, আত্মঘাতী নেশা থেকে মুক্তি দাও। আমার সমস্ত রক্ত শুকিয়ে গেলো যে। আমার সমস্ত পৃথিবী তা কেড়ে নিয়েছে, শুধু রেখেছে আমার নিজের রক্তহীন, শ্বেত ব্যক্তিত্ব—সত্তার সার শুষে নেবার পর এখন একমুঠো ছিবড়ে শুধু। আমি যেন ভুলতে পারি, মিলতে পারি, নিজেকে দিতে পারি, নিজেকে হারাতে পারি। আমাকে দাও সেই বিনয় যাতে মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে গ্রহণ করতে পারি। নিজেকে ভুলতে পারি যেন।

কিন্তু কেমন ক'রে নিজেকে ভুলবো, এই তো প্রশ্ন। এমন-কিছু চাই যা আমি নই, যা আমার থেকে আলাদা। অন্য-কিছু: আমি-সংস্পর্শের কলঙ্ক যাতে লাগেনি। যা তুলে নেবে চেতনার এই অসহ্য ভার, অন্ধ ক'রে দেবে, জাগিয়ে তুলবে অন্ধকারের জীবন্ত, জ্বলন্ত বন্যা। আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাও, আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাও। মানুষ মদ খেয়ে নিজেকে ঘুম পাড়িয়েছে—এইজন্যেই তো। সেই পবিত্র, আত্ম-স্পর্শহীন অন্ধকারের স্বাদ পেতে—হোক না ক্ষণকালের জন্য। সেটা একটা উপায় বটে। কিন্তু সেটা নেহাৎই মুখ রক্ষা করা, সাময়িক একটা বন্দোবস্ত মাত্র। তাতে হবে না, প্রাণ বাঁচবে না তাতে। এমন নেশা চাই যা কখনো কাটবে না, চিরকাল যার মধ্যে নিজেকে ভুলে থাকতে পারবো। কী হ'তে পারে তা? আছে পৃথিবীর কবি আর শিল্পী, তারা বলবে—। কিন্তু সকলেই তো আর ব্লেক হ'য়ে জন্মায় না। এই প্রকৃতি পারে বাঁচাতে: মেঘ আর জল, চাঁদ আর সূর্যাস্ত, ঘাস, পোকা, পাতা, বিকেলের ছায়া। এত কাছে এ-সব জিনিশ, এত প্রত্যক্ষ: তবু এরই মধ্যে আমরা পেতে পারি আমাদের চরম মুক্তি। এমন লোক আছে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সারাবেলা কাটিয়ে দিতে পারে—কেমন ক'রে সময় কাটলো তা বুঝতে পারে না। রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ায় খেলায়। তাদের কোনো ভয় নেই: তারা প্রবেশ পেয়েছে জীবনের গভীর, গোপন উৎসে। আর সেই-সব মানুষ, যারা সৃষ্টি করে। নিজেকে প্রকাশ করবার অফুরন্ত আগ্রহে

যারা কাঁপছে। সারারাত ব'সে-ব'সে একজন লিখছে, লিখে যাচ্ছে—তার সেই নিবিড় তন্ময়তার আনন্দ আমি কখনো জানবো না। দেবতার মতো সেঃ পরিপূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে সংশয়হীন। এরা ভাগ্যবান, জীবনের অন্তঃপুরে এদের অধিকার, এরা দেখেছে পরমতম রহস্যকে মুখোমুখি। আর আমরা শক্তি পাই এদের কাছ থেকে; এদের অগ্নি-স্পর্শে আমাদের উজ্জীবন। এদের কথা আমরা ভাবি, এদের তৈরি কথাগুলো বার-বার উচ্চারণ করি মনে-মনে। আমরা বই পড়ি, সেখানে পাই শান্তি, পাই শক্তি। পৃথিবীতে এত বই যদি লেখা না-হতো তাহ'লে কি বাঁচতে পারতাম?

কিন্তু যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয় সেটা। শুধু সেই পরোক্ষভাবে গ্রহণ—তাতে চলবে না। তা আমাদের খানিকটা বাঁচিয়ে রাখতে পারে তা ঠিক; অনেকখানি, হয়তো; কিন্তু সেটা সব নয়, সেটা শেষ নয়। তা আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারে না এই বিষাক্ত আত্মবদ্ধতা থেকে। অনেক সময় বইয়ের মধ্যেও নিজেকেই শুধু পড়ি। ঐ চরিত্র আমি। ঐ ঘটনা তো আমারই জীবনের। এ-কথা তো আমারই মনের কথা। না, কেবল বই নিয়ে আমরা বাঁচবো না। অন্য কিছু চাই।

শরীরটাকে টান ক'রে মেলে দিয়ে অবিনাশ শুয়ে রইলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে। তারাদের মুখোমুখি। তোমার মুখোমুখি, হে ঈশ্বর। These immeasurable silences frighten me. These immeasurable silences frighten me not.

একই কথা। আত্ম-মুক্ত, নির্ভীক পুরুষ, দুঃসাহসী দৃষ্টিতে রাত্রির তারা-ছড়ানো, শাদা-মেঘ-জড়ানো আকাশের দিকে তাকিয়ে। কিছু তারা দেখেছে যা এই পৃথিবীর অতীত, আমাদের এই সময়ের অতীত। দেখেছে ঈশ্বরকে। মিস্টিক, লোকে তাদের নাম দিয়েছে। হাজার-হাজার পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে তাদের বিষয়ে। কিন্তু এত সহজ। এত সহজ যে বোঝাবারই কিছু নেই। আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেলো খুলে। এই তো তোমার প্রেম ওগো। এই বিশাল, নিঃশব্দ অন্ধকারের বুক চিরে দৃষ্টির দুঃসাহসী পাখি কোথায় উড়ে চললো। আমার ভয় করে। আমার ভয় করে না। দু-জনেই দেখেছে, চেয়ে থেকেছে, আকাঙ্ক্ষা করেছে। ঊর্ধ্ব-উৎসুক আত্মা। অসীম অন্ধকারের বুক চিরে উড়ে চলেছে রুপালি পাখি। আকাশ-পিপাসু। সূর্য-পিপাসু। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে—এখানেই, এখানেই। রাত্রির আকাশ দেখে আমাদের ভয় করে না। ভয় যে করতে পারে তা আমরা জানিনে। ভয় করবার কি না-করবার কথা ওঠে না তাই। আমরা তার দিকে ফেরাই আমাদের আত্ম-অন্ধ দৃষ্টি: সমস্ত আকাশ তার সমস্ত সৌরমণ্ডল আর জ্বলন্ত তারাপুঞ্জ নিয়ে নিঃসাড়, নিশ্চেতন হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর যারা সেই আকাশে অন্য-কিছু দেখতে পায় তাদের আমরা বলি মিস্টিক, ঘরে দরজা এঁটে হাজার পাতার বই লিখি তাদের নিয়ে।

ঠাণ্ডা হাওয়া খেলা ক'রে গেলো তার চুলে। দক্ষিণের হাওয়া,

সোজা সমুদ্র থেকে আসছে। কলকাতা সমুদ্রের আরো একটু কাছে হ'লেই পারতো। যেটুকু কাছে, তারই জন্যে কলকাতার স্বাস্থ্য বাংলার অন্য যে-কোনো জায়গার চাইতে ভালো। না কি, কর্পোরেশনের ব্যবস্থা ভালো ব'লেই? শহরের সমস্ত পুরীষ যে-নদীতে গিয়ে পড়ে সেই নদীর জলই আমরা খাই: বিজ্ঞানের আশ্চর্য কসরৎ। কী সেই ফাঁড়ির নাম? বিদ্যাবতী? বিদ্যাধরী? গঙ্গার সঙ্গে যোগ আছে নিশ্চয়ই? তবু ভালো। জলের আর মলের নল মাটির নিচে পর-পর সাজানো। বেশি বৃষ্টি হ'লে চুঁইয়ে পড়ে, মিশে যায়: টাইফয়েড। গেলো বর্ষায় খুব লেগেছিলো। আশ্চর্য, রাস্তায় এই জল দাঁড়ানো সম্বন্ধে কর্পোরেশন কি কোনোকালেও কিছু করতে পারবে না? তবু—আরো বেশি যে মেশামেশি হয় না, শহরের অর্ধেক লোক যে টাইফয়েডে মরে না এটাই আশ্চর্য। জলের আর মলের নল রাস্তার নিচে পর-পর। আরো কত। ইলেক্‌ট্রিসিটির তার: টেলিফোন। আর কী? ও, গ্যাস। রাস্তার নিচে একটা জঙ্গল। সভ্যতার বাহু সমস্ত শহর ভ'রে ছড়ানো। মাটির তলা দিয়ে, অন্ধকার সুড়ঙ্গে পথ খুঁড়ে-খুঁড়ে চলেছে। আশ্চর্য!

সন্ধ্যার চাইতে আরো একটু মৃদু হাওয়া খেলা ক'রে যাচ্ছে তাকে ঘিরে, অদৃশ্য আদরের মতো। একবার সে হাত বুলিয়ে গেলো মুখের উপর, পায়ের আঙুলগুলো বাঁকিয়ে আবার খুললো। এলোমেলো কালো রাত্রি আকাশ ভ'রে ছড়ানো। উত্তরের দিকে কেমন একটা ঘোলাটে ইটের মতো রং, যেন খানিকটা আকাশের ছাল

ছ'ড়ে গিয়ে কাঁচা মাংস বেরিয়ে আসছে। এসপ্লানেড ছুঁড়ে মারছে উপরের দিকে তার আলোর পিচকিরি। বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন। আলোর চাবুকে আকাশকে মারছে যেন। বাকি আকাশে নরম, অস্পষ্ট মেঘ, ঘুমের মতো নরম অন্ধকার। আমাকে এই রাত্রির মধ্যে মিশিয়ে নাও, আমাকে এই রাত্রির ক'রে তোলো। এই চিন্তার আর দ্বিধার আর মনোকণ্ডূয়নের পাপ থেকে এই রাত্রি আমাকে মুক্তি দিক। যদি এই আকাশের দিকে মুখ তুলে শুয়ে-শুয়ে স্তব্ধ, অন্ধ হ'য়ে যেতে পারতুম, অন্ধকারের আঘাতে একেবারে অন্ধ হ'য়ে যেতে পারতুম যদি, তাহ'লে আমি বাঁচতুম।

বাঁচতে চাই : এই তো আমাদের জীবনের একমাত্র কথা। অবশ্য পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের তা নিয়ে বিশেষ ভাবনা নেই : শরীরের চাহিদাগুলোর ব্যবস্থা যদি থাকে তাহ'লে কী করতে হবে, কী ক'রে চলতে হবে তারা তা জানে। কতগুলো ছক-কাটা সামাজিক ব্যবহার আছে : তার বাইরে যাবার কথা মনে হয় না। কিন্তু অন্য একদল আছে যারা জীবন সম্বন্ধে এক-একটা বিশেষ রকমের ধারণা ক'রে নেয়, দুঃখ পায় তার সঙ্গে মেলাতে না-পারলে। আর তাই তারা চিরকাল বিক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত, অশান্ত। কেউ-কেউ ভালো ক'রে ঠিক জানেই না তারা কী চায়, ভালো ক'রে বুঝতেই পারে না। তারা ছোটে অসম্ভবের পিছনে : যে-সোনার হরিণ বনের ফাঁকে-ফাঁকে ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগিয়ে মিলিয়ে যায়। সে কি চিরকাল অমন ক'রে পালিয়ে যাবে, শুধু হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকে ঘা দেবে মনে? আর তা-ই নিয়ে কত দীর্ঘশ্বাস, কত কান্না, কত

সান্ত্বনার চেষ্টা। আমিও তো বলি নিজের মনে: বাঁচতে চাই। কিন্তু এই যে বলছি বাঁচা, এ-ব্যাপারটা কী? কী করলে ঠিক বাঁচা হবে?

আমরা কেন ব্রতযাপনের মতো দিনযাপন করতে পারি না—নতুন একজন লেখক বার-বার আক্ষেপ করছে এ-কথা ব'লে। কেন? সত্যি, কেন পারি না? জীবন যদি হ'তো নিরবচ্ছিন্ন ব্রত; কাজ আর বিশ্রাম, সমস্ত কথা আর চিন্তা যদি বাঁধা হ'তো এক গভীর, অন্তর্লীন আনন্দের ছন্দে; যদি ভোরবেলার আর দুপুরের আর বিকেলের আর রাত্রির বিশেষ এক-একটা সুরে আমরা ঝংকৃত হ'তাম; যদি ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের রক্তে খেলতো জোয়ার-ভাটা; যদি সূর্যের আগুনের স্রোত আর চাঁদের শান্তির স্রোত দিন আর রাত্রির মতো আমাদের উপর দিয়ে ব'য়ে যেতো। তাহ'লে আমরা মরতে পারতুম—তাহ'লে আমরা বাঁচতে পারতুম। প্রতি মুহূর্তের চরম উপহার কাড়তে চাইতুম না; ছেড়ে দিতে পারতুম, অপেক্ষা করতে পারতুম। শোকে, বিরহে, ব্যর্থতায় যে-মৃত্যু তার বিরুদ্ধে তিক্ত আক্রোশে ছিঁড়ে যেতুম না; সহজে তাকে মেনে নিতুম—সাহস করতুম মরতে—এই আশ্বাসের জোরে যে আবার বেঁচে উঠবো। জীবনকে নিতুম দেবতার হাত থেকে: যে-দেবতা ধ্বংসের আর উৎসবের, যে-দেবতা রুদ্র আর যে-দেবতা শিব। দ্বিমূর্তি দেবতার লীলার ছন্দ লাবণ্য আনতো জীবনে—ব্রতযাপনের মতো যদি দিনযাপন করতে পারতুম। নিজেকে কখনো ও-রকম

ক'রে পাইনে সেটা আক্ষেপ নয়ঃ আক্ষেপ এই যে কখনো-কখনো ও-রকম ক'রেই পাই, কিন্তু সব সময় পাই না। সেটা যে কী, তা যদি একেবারেই না জানতুম, তাহ'লে কি আক্ষেপ এমন তীব্র হ'তো? কোনোদিন সকালে ঘুম ভেঙে হয়তো দেখি মনের মধ্যে একটা সুর বাজছে, ঘুমের মধ্যে কে যেন ছুঁয়ে গেছে। আর সারাদিন আমরা আস্তে চলি, আস্তে কথা বলি; যা-কিছু করি একটা অনুষ্ঠান হ'য়ে ওঠে, কাজ হ'য়ে ওঠে কোন পূজার আয়োজন। একটা ভয় থাকে মনে, কখন অসাবধানে সুর কেটে যায়। এমন দিন এসেছে আমাদের অনেকেরই জীবনে। কিন্তু তারপরই আবার ক্লান্তি, আবার অবসাদ, আবার দীর্ঘ, অসহ্য, ভাষাহীন ভালো না-লাগা। বাইরের জীবনের অনেক ছোটো-ছোটো জিনিশ ভিতরটাকে ঘোলাটে ক'রে তোলে। আর নিজেরই ভিতরে কত ব্যতিক্রম, কত অসংগতি, কত আত্ম-বিভেদ। আর দাঁত-বার-করা, পিচ্ছিল-লালায়িত সংসার—তার ক্লেদাক্ত সংস্পর্শের অসহ্য অপমান আমাদের মারতে আসে। চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো চীৎকার ক'রে ওঠে সমস্ত আত্মা: কোথায় ডুবে যায় তার মধ্যে সেই সূক্ষ্ম সুর।

না, ওতেও হবে না। ব্রতযাপনের সেই অতি সূক্ষ্ম সুর কাটবেই, কেমন ক'রে ঠেকাবে তাকে? অমন নিখুঁত মাত্রা সব সময় কি বজায় রাখা যায়? তা হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকেই আসবে, তা-ই আসতে বাধ্য। আমরা ইচ্ছা দিয়ে সেটা সৃষ্টি করতে পারি না, তৈরি করতে পারি না বাইরের আয়োজন দিয়েঃ তার জন্য অপেক্ষা

করতে হয় অপরিসীম ধৈর্যে ও বিনয়ে—তা ছাড়া উপায় নেই। সোনার হরিণ চিরকাল পালিয়ে বেড়াবে বনের ফাঁকে-ফাঁকে। জীবনের দুর্লভ মুহূর্ত—ক্ষণকালের ইন্দ্রধনু স্বর্গের সীমা পর্যন্ত জ্ব'লে উঠলো। অপরূপ, অপরূপ : কিন্তু শুধু ওতে হবে না। পরিপূর্ণতা চাই। সংশয়হীন, ক্ষয়হীন পরিপূর্ণতা। রক্তের মধ্যে যা মিশে গেছে, এক হ'য়ে গেছে সমস্ত জীবনের স্রোতে। আ—যদি এই আত্ম-চেতনার বিষ নিঃশেষে নিংড়ে বার ক'রে দিতে পারতাম, তবে আত্মার সেই শূন্য পেয়ালা ভ'রে উঠতে পারতো অভাবিত, অতুলনীয় ঐশ্বর্যে। তাতেই পূর্ণতা : নিশ্চেতন, স্বত-উৎসারিত সেই স্রোতে। চিরকাল নতুন হ'য়ে উঠছে, চিরকাল ধ'রে ঠেলে উঠছে অন্ধকারের রহস্য-উৎস থেকে। কোনো ভাবনার দরকার করে না ; বুঝি তাকে হারালাম এই ভয়ে ম'রে থাকতে হয় না। সেখানে শান্তি। আমাদের সমস্ত কামনা আর ব্যর্থতা আর নিজেকে টুকরো-টুকেরা ক'রে ছিঁড়ে ফেলার যন্ত্রণা, বিশ্বের দর্পণে নিজের সহস্র প্রতিমূর্তি দেখার দুঃস্বপ্নের পরে যে-শান্তি আসে। যে-শান্তি নামে দিগন্তে সন্ধ্যার মতো, আকাশ ভ'রে রাত্রির মতো। তাহ'লে উদঘাটিত হ'তো জীবনের নতুন রূপ। তাহ'লে আমরা সার্থক হ'তে পারতুম প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের বাঁচায়। আচ্ছাদন স'রে যেতো জীবনের মুখ থেকে, প্রাণের সহজ, সবুজ খুশি হ'য়ে ওঠায় হ'তো আমাদের চিরন্তন লালন। ঝরনা লাফিয়ে যায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে ; চিতাবাঘ জীবন্ত মৃত্যুর মতো শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে ; সূর্যের জ্বলন্ত খড়্গের ছায়া সমুদ্রকে অগ্নিময় ক'রে

তোলে: এখানে বেজে ওঠে শিশুর হাসি জলতরঙ্গের মতো; চড়ুইপাখি কুটো কুড়িয়ে এনে-এনে জড়ো করে, চড়ুইপাখি তার শান্ত-অপেক্ষমান স্ত্রীকে ঘিরে লেজ উঁচু ক'রে নাচে; ময়ূর তার রামধনু-রঙিন পেখম মে'লে দিয়ে অপরূপ গর্বের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়; নক্সা-আঁকা সাপ পাতার উপর দিয়ে শিরশির ক'রে চ'লে যায়; এখানে কোনো মেয়ে রোদে দাঁড়িয়ে তার লাল চুল আঁচড়ায়, আর কে-একটা লোক রোজ রাত্তিরে গান করতে-করতে কাজ থেকে ফেরে, আর সুশ্রী যুবক তার কালো চুলে ভরা মাথা ঝেঁকে ব'লে ওঠে, 'ব'য়ে গেলো!' এই পরিপূর্ণতা আমরা চাই, এই সহজ, গভীর, আত্ম-অচেতন খুশি হ'য়ে ওঠা: নয় তো বুদ্ধির সমস্ত হাত-পা-ছোঁড়া নিয়ে বাঁচবার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু কেমন ক'রে হবে? আ—সে-কথা বলবার নয়, সে-কথা বলবার নয়। নিজের মনে-মনে রুদ্ধস্বরেও তা উচ্চারণ করা যায় না। এই রাত্রিতে তারাদের মুখোমুখি শুয়েও না। অনুচ্চারণীয়, নামহীন, ভীষণ সেই রহস্য। কিন্তু সে-ই তো উপায়, সে-ই তো একমাত্র উপায় যাতে আমরা জানতে পারি কবির অনির্বচনীয় আত্মবিস্মৃতির পরিপূর্ণতা। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। সেখানে আমরা যেতে পারি শুধু সেই ভীষণ, নিঃশব্দ অন্ধকারের স্রোত বেয়ে। তারই মধ্যে, শুধু তারই মধ্যে সেই বিশাল, বিদ্যুৎ-স্পন্দমান মুক্তি—কবি যখন রাত্রির জানলার ধারে ব'সে-ব'সে লেখে, তার সেই অতীন্দ্রিয় সংবেদন। O world invisible, I view thee! O world invisible! অদৃশ্য,

স্পর্শাতীত জগৎ, আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমাকে স্পর্শ করি। আমি, আমিও পারি। আমারও মধ্যে আছে সেই নামহীন, অনুচ্চারণীয় রহস্য। সে-রহস্য আছে আমার শরীরেই। তাকে যখন আমি স্পর্শ করবো, হে অদৃশ্য জগৎ, তার সেই বিদ্যুৎময় স্ত্রী-শরীরে তোমাকেই স্পর্শ করবো। আমি ভেসে যাবো তোমারই দিকে—তুমি, অসংবেদনীয়, অনির্বচনীয়—আমি ভেসে যাবো তোমারই দিকে অন্ধকারের স্রোতে। যখন তাকে স্পর্শ করবো। ঢিপঢিপ, ঢিপঢিপ করবে অন্ধকারের হৃৎপিণ্ড: কূলহীন সেই সমুদ্র; বিশাল কালো সেই সমুদ্র; দিগন্তহীন, চিহ্নহীন, শব্দহীন; নিবিড়তম নিশীথের মতো কালো, সময়ের উপর দিয়ে প্রবল, নিঃশব্দ স্রোতে গড়িয়ে যাচ্ছে—চিরকালের বুকের উপর শুধু সেই উত্তপ্ত, উন্মত্ত হৃৎ-স্পন্দন। তোমাকে আমি দেখবো, তোমাকে আমি স্পর্শ করবো, তোমারই মধ্যে আমি মিশে যাবো। যখন স্পর্শ করবো তাকে।

শাদা একটা ছায়া অন্ধকারে কেঁপে উঠলো যেন। অবিনাশ তাকালো, তারপর উঠে বসলো।

—'তুমি এখানে!'

'চমৎকার ঠাণ্ডা,' বললো অবিনাশ।

'তোমাকে খুঁজছি সারা বাড়ি।'

'কেন?'

'কেন কিছু নয়। এখনো শোওনি যে?'

'শুয়েই তো ছিলুম।'

'না, যাও, এবার শুয়ে পড়ো। এগারোটা বেজে গেছে।'

'তুমি এতক্ষণ কী করলে?'

'ব'সে ছিলুম বৌদির কাছে। তুমি একবার এলে তো পারতে।'

'চলো এখন যাই।'

'না, না, একটু শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছেন। এখন আর গিয়ে কাজ নেই।'

'বেশ, তুমি তাহ'লে একটু বোসো এখানে।'

পাটির একপ্রান্তে ব'সে সন্ধ্যামণি বললো, 'রাত বাড়লে রীতিমতো ঠাণ্ডা। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো বরং।'

অবিনাশ একটু চুপ ক'রে রইলো।—'ভাবছিলুম তোমার বাবার চিঠির উত্তরে কী লিখি।'

উঁচু-করা হাঁটুর উপর থুতনি চেপে সন্ধ্যামণি বললে, 'কী আবার লিখবে!'

'শোনো, তোমার যাওয়াই ভালো।'

সন্ধ্যামণি মাথা না-তুলে অবিনাশের চোখের দিকে চোখ তুললো।—'এতক্ষণ ভেবে এ-ই ঠিক করলে তুমি?'

'আমার ভুল হয়েছিলো,' হঠাৎ ব'লে উঠলো অবিনাশ।

'ভুল?'

'আমি তোমার মরজিতে সায় দিয়েছিলুম। কিন্তু তুমি আর এখানে থাকতে পারো না। তোমাকে যেতেই হবে।'

সন্ধ্যামণি চুপ ক'রে রইলো, আনত তার চোখ।

'তোমাকে যেতেই হবে—বুঝলে? না-গেলেই চলবে না!'

অবিনাশ হঠাৎ বুঝতে পারলো তার গলার স্বর চড়ছে। তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে বললো, 'শোভার জন্যে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করবো। তোমাকে কিছু বলতে হবে না ওকে; তুমি চ'লে যাবার পর আমি বলবো।'

'আবার কেন এ-সব কথা?' খুব আস্তে জবাব দিলো সন্ধ্যামণি।

'তুমি বুঝতে পারছো না, না?' হঠাৎ কী-রকম হিংস্র শোনালো অবিনাশের গলা।

সন্ধ্যামণি একটু অবাক হ'য়ে চোখ তুললো।

'শোনো, আমি ঠিক করেছি তোমাকে যেতে হবে। বুঝতে পারছো?'

সন্ধ্যামণি তার খোলা চুলের একটা গোছা আঙুলে জড়ালো। —'বুঝতে পারবো না কেন।'

'বেশ, তাহ'লে তুমি আমাকে কথা দাও যে যাবে।'

সন্ধ্যামণি চুলের গোছাটা আঙুল থেকে খুলে কাঁধের উপর দিয়ে ছেড়ে দিলে।—'কবে যেতে হবে, বলো।'

'কাল—কালই যাবে—আর একদিনও দেরি না!'

'বেশ, তুমি যা বলো তা-ই হবে।'

'না, বলো যে কাল যাবে—নিজের মুখে বলো!'

'কালই যাবো।'

ঝাপসা হ'য়ে এলো অক্ষরগুলো। অবিনাশ বইটাকে ভাঁজ

ক'রে একহাতের আঙুলের মধ্যে ধ'রে চোখের আরো কাছে নিয়ে এলো। ছাপানো পৃষ্ঠাটা আবার স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, উজ্জ্বল। কোথায়? এই যে। এখনই ঘুমিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না: সাড়ে-এগারোটা, বড়ো জোর। ঘুমোতে চেষ্টা করা উচিত নয়, ঘুম আসতে দেয়া উচিত। জোর ক'রে ঘুমোতে গেলেই খিঁচড়ে যায়। রাতগুলো এখনো ঠাণ্ডা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ভরা গ্রীষ্মের সেই ভয়ংকর চেপে-ধরা রাত্রি। ইলেকট্রিক পাখার হাওয়াতেও যেন গা জ্ব'লে যায় শেষ পর্যন্ত। হ্যাঁ, এই যে।

একটু পরে দু-আঙুলে চেপে পাতা ওল্টালো। একটা ভাঁজ পড়লো পাতার কোণে।

সত্যি, ঘুমের আগে পড়বার জন্য আলাদা রকমের বই তৈরি হওয়া উচিত। ছোটো বই, কাগজের মলাট। ফিকে সবুজ রঙের মলাট। শস্তা দাম: পাতা ওল্টাতে যত্ন নিতে হয় না। ছিঁড়ে গেলে আর-একখানা কিনতে পারো। The Bed Books. আশ্চর্য, কোনো বিলিতি পাব্লিশরের মাথায় এটা আসে না। পৃথিবীর সব ভালো-ভালো বই থাকবে সিরিজে। The Best Books. The Bed Books. চমৎকার স্লোগান বিজ্ঞাপনের। এটা কি ঠিক নয় যে আমাদের অনেকের জীবনেই যে শেক্সপিয়র পড়া হয় না তার কারণ শেক্সপিয়র পাওয়া যায় হয় জাঁদরেল গ্রন্থাবলীতে নয় তো নোটওয়ালা পাঠ্যকেতাবের চেহারায়? যতই ভালো লেখা হোক শক্ত হ'য়ে চেয়ারে ব'সে পড়তে হ'লেই—। The Bed Books. Suits your pocket in size and

price. Read a book in bed. Read a bek in bood. Bead a rook in bed. অক্ষরগুলো হঠাৎ কয়েকটা জ্যান্ত পোকার মতো তার চোখের সামনে লাফিয়ে উঠলো। ও! মৃদু একটা ধাক্কা যেন লাগলো মাথায়। চমকে চোখ মেললো সে।

বইটা সরিয়ে রাখলো বালিশের পাশে। তারপর বেড-স্থইচ টিপে ঘর অন্ধকার ক'রে দিয়ে পাশ ফিরলো। চোখে ঘুম জড়ানো: আজ রাত্রে সে ভালো ঘুমোবে। দুটো বালিশের মধ্যিখানে একটা হাত চালিয়ে দিলে। যতটা আরাম ক'রে শোয়া যায়। শরীরটাকে ছেড়ে দাও, একেবারে ঢিলে ক'রে দাও; মনটাকে দাও খালি ক'রে। আটকে আসছে চোখ। আঃ! মধুর, ঘুমিয়ে পড়া; ঠিক ঘুমিয়ে পড়বার আগে এই কয়েকটা মুহূর্ত। সব ঝাপসা, অস্পষ্ট। কুয়াশা-জড়ানো বিশ্ব। কিছুতে আর কিছু এসে যায় না। মৃত্যু কি এইরকম? যদি কেউ বলতো, যদি কেউ বলতে পারতো যে মৃত্যু এইরকম! সত্যি কি তারা খুব কষ্ট পায়, যারা মরে? দেখে তো কতই মনে হয়। কিন্তু সেটা আমাদের কল্পনা হ'তে পারে—হ'তে পারে না? বলে যে জানোয়ারদের মৃত্যু-যন্ত্রণা নেই। টিকটিকি যখন পোকা ধরে, ধরা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পোকাটার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, কিছু টের পায় না। সম্মোহন। ধরো, মানুষেরও ও-রকম কিছু হ'তে পারে না? অনুভব করবার ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে যায় অনেক আগেই: শরীরে যে-সব ছটফটানি সেগুলো নেহাৎই পেশীগত প্রতিক্রিয়া। রিফ্লেক্স অ্যাকশন। এমনিও তো

মাঝে-মাঝে আমাদের এক-একটা পেশী হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। হাঁটু দুটো খানিকক্ষণ নাড়াও: তারপর হয়তো নিজে থেকেই নড়তে থাকবে। যাকে আমরা বলি মৃত্যু-যন্ত্রণা, আসলে হয়তো ঐরকমের কিছু। কিন্তু কে বলবে!

যাকগে, এখন ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ছে সে। তলিয়ে যাচ্ছে ঘুমে। ঘুম, ঘুম। এই সে ঘুমিয়ে পড়লো। স্তব্ধ হ'য়ে সে রইলো কতক্ষণ কে জানে। ঘুমিয়ে পড়ছে, এইবার সে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু তাহ'লে মনে-মনে বলতে পারছি কী ক'রে—এই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রাস্তা থেকে ক্ষীণ একটা শব্দ। একটা মোটর গেলো ছুটে। দেখি আর কোনো শব্দ শুনতে পাই কিনা। পাখির পাৎলা চ্যাঁচামেচি কোথায় যেন। টিন পেটাবার আওয়াজ পাশের লোহার দোকানটায় বুঝি। হঠাৎ রাস্তায় কুৎসিত, বেসুরো গলায় গান:

ও সে চ'লে গেলো
ব'লে গেলো না—

মাতাল, নিশ্চয়ই। রাস্তার মধ্যেই প'ড়ে যাবে না, আশা করি। মোটর-চাপা পড়বে হয়তো, কে জানে। হয়তো স্ত্রী আছে বাড়িতে, আর দুটি-তিনটি ছেলেমেয়ে। বৌটা বেজায় বদমেজাজি, সেইজন্যেই বেচারা—

না, ঘুমোতে হবে। সে আবার পাশ ফিরে খুব শক্ত ক'রে

চোখ বুজলো। গীতরসিক মাতাল দূরে চ'লে গেছে। এখন চুপচাপ। ঘুমোবেই, সে ঘুমোবেই। একটু চুপ ক'রে থাকো, কিছু ভেবো না: অমনি ঘুম এসে পড়বে। আর ঐ ঘরটায়, ধবধবে শাদা বিছানায় শুয়ে, শোভা মরছে। মরছে! কী ভয়ানক! হয়তো এখনই মরছে। হয়তো এখনই ম'রে গেছে; ধরো, ঘুমের মধ্যে যদি—। বাড়ির মধ্যে এক মৃতদেহ নিয়ে সমস্ত রাত্রি—সে জানতেও পারছে না। খুব কি লাগবে তার মরতে? তারিণীবাবু, বুড়োমানুষ, একটা শোক পাবেন। তিনি দু-বার এসে দেখে গেছেন সস্ত্রীক—বেশি নড়াচড়া করার বয়স তাঁর নেই। কালও এসেছে চিঠি। খুকি কেমন আছে? খুকি: তাঁর বড়ো মেয়ে। সেদিন মারা গেলো ছেলে—একেবারে ভরা জীবনের মাঝখানে। ভদ্রলোকের কপালই খারাপ। তবু, মানুষকে তো মরতেই হবে। সমস্ত পৃথিবী ভ'রে প্রতি মুহূর্তে মানুষ মরছে। এই একজন মরলো। এই একজন মরলো। Shova expired last night: একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। ডাকঘরের কেরানি অনায়াসে এটাকে টরে-টক্কা করবে: এক মুহূর্ত ভাববে না কে মরলো আর কার কাছে খবরটা যাচ্ছে। না কি চিঠি লেখাই ভালো? টেলিগ্রামটা এমন সাংঘাতিক, বুকের উপর হাতুড়ির বাড়ি মারে। বুড়ো ভদ্রলোক, এমনিতেই অস্থির হ'য়ে আছেন। শ্রীচরণেষু, কাল রাত্রে শোভা—। গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি—। নাঃ অসম্ভব। কী ক'রে এই খবরটা চিঠিতে দেয়া যায়? টেলিগ্রামই ভালো।

বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলে। হঠাৎ যেন গরম লাগতে আরম্ভ করলো। কেমন একটা তামসিক তন্দ্রার মধ্যে শুয়ে আছে: ঘুম নয়, জেগে-থাকা নয়। ঘুম কি আসবে না? একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে পা দুটো সোজা ক'রে মেলে দিলে। পা সোজা ক'রে শোয়া নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আর সে চিরকাল হাঁটু দুটো প্রায় বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে—। ও, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু যেন বলা না হয়। বিয়ের পর শালিরা অনেক হাসাহাসি করেছে তাকে নিয়ে। কী গো, হাড়-বের-করা পণ্ডিত? কী স্বাস্থ্য ছিলো শোভার। অথচ সে-ই আজ মরছে। কিছু বলা যায় না, অদৃষ্ট। যমের সঙ্গে তো জোর চলে না।

কী ফাঁকা হ'য়ে যাবে বাড়িটা। শোভা যেন তার রোগ দিয়েই সমস্ত বাড়িটা ভ'রে ছিলো। তারপর আর-কিছু করবার থাকবে না; কিছু থাকবে না ভাববার কি ভয় করবার কি আশা করবার। কেমন খালি-খালি লাগবে। চ'লে যেতে হবে কিছুদিন কলকাতার বাইরে। ছেড়ে দেবে এই বাড়ি। কী দরকার এত বড়ো বাড়ি দিয়ে? কারো মান বাড়াতে হবে না আর। নিজেকে কারো জীবনের অলংকার ক'রে তুলতে হবে না। বহুদিন মনে ছিলো আশা। কী আশা ছিলো? ভুলে'ই গেছে প্রায়। নিজের জীবনের কোনো ছবি ভালো ক'রে মনে-মনে আঁকার সময় পর্যন্ত পায়নি। হঠাৎ এই জীবনের মধ্যে তাকে ঠেলে ফেলা হ'লো—ভালো ক'রে বুঝতেই পারলে না। বাবা যাতে বিয়ে করতে পারেন সেইজন্যে তার বিয়ে। বাবাকে সুখী করতে হবে,

আর-কিছু ভাববার নেই। বিশেষ-কিছু ভাববার বয়সই কী তার হয়েছিলো? এমনি ক'রেই তো বিয়ে হয়; বিয়ে তো এইরকমই। আমি যা পেয়েছি, তা ছাড়া অন্যরকম কিছু আছে ব'লেই যদি না জানি তবে সুখী হ'তে বাধা কোথায়? শোভা এঁকেছিলো নিজের জীবনের স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ছবি, আর তার সঙ্গে অনেকটা মিলেও গিয়েছিলো তার জীবন। যেটুকু হয়তো খাপছাড়া ছিলো সে মিলিয়ে নিয়েছিলো নিজের যত্নে। সুখী, সুখী স্ত্রী। বেচারা, আর এখন কোথায় যাচ্ছে। কী কষ্ট হচ্ছে তার ছাড়তে। কেন সে সহজ করতে পারছে না, নিজেকে অকারণে আরো বেশি কষ্ট দিচ্ছে কেন?

চুলের মধ্যে একবার আঙুল চালিয়ে দিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ঘুমোতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেললো। কবে একবার কোথায় পড়েছিলো অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণ তাকিয়ে থাকবার চেষ্টা করলেই ঘুম এসে পড়বে। রইলো তাকিয়ে। বাজে কথা। লোকে তো কতই বলে: ফুলের বাগানের কথা ভাবো, ভাবো জলের শব্দ। ওয়ার্ডস্বার্থের সেই কবিতা। ছেলেবেলায় যে-রকম ঘুমোতাম আর কখনো কি সে-রকম ঘুমোবো না? ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে আসছে, ঘুমের চাপে ম'রে যাচ্ছি, এ-অবস্থাটা আর-একবার জানতে ইচ্ছে করে। একবার দেওঘর গিয়েছিলো বাবার সঙ্গে। জশিদিতে সন্ধের সময় গাড়ি-বদল। দেওঘরের গাড়িতে উঠে সেই যে তার ঘুম পেলো—কী ক'রে যে স্টেশনে নামলো, ঘোড়ার গাড়িতে উঠলো, বাড়ি পৌঁছে

জামা ছাড়লো—! ব'সে থাকার চেষ্টায় হাড়গুলো যেন ভেঙে যাচ্ছিলো। আর হঠাৎ মাঝে-মাঝে দৃষ্টিহীন চোখ মেলে দেখা— স্টেশন, রাস্তা, একটা ঘর, লোকজন। তারপর একমুহূর্তে সব মুছে গেলো, মিলিয়ে গেলো। এখনো তার কী-রকম রোমাঞ্চ হয় সেই রাত্রির, সেই ঘুমের কথা ভাবতে। ঘুম পাওয়া কাকে বলে, তা একরকম ভুলেই গেছে। আর-কিছু করবার নেই, আর-কিছু করবার নেই; অতএব শুয়ে পড়ো। আর শুলে ঘুম এক সময়ে আসবেই। কিন্তু এক-একটা রাত্রি আসে দুঃস্বপ্নের মতো— আজকের রাত্রি কি সেইরকম হবে? ভয়ে তার বুক যেন কেঁপে উঠলো।

আবার আলো জ্বেলে বই পড়বে? ওটা নয় তো, অন্য কোনো বই। কিন্তু আবার বিছানা ছেড়ে ওঠা! আর এমন-কোনো বই সে মনে আনতে পারলে না যা পড়তে এখন তার ভালো লাগবে। বই কোনো কাজে লাগে না—যখন আমরা কষ্ট পাই, যখন আমরা ঘুমোতে পারি না, বই কোনো কাজে লাগে না তখন। মন যখন এমনিতেই ভালো থাকে তখনকার জন্য বই। আবার বুজে এলো তার চোখ। বিশ্রী, চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা। খামকা সে ভয় পাচ্ছে, এখনই ঘুম আসবে। খুব বেশি রাত এখনো হয়নি। চুপ ক'রে থাকো, চুপ ক'রে থাকো। কিন্তু সেটা কি খুব দোষের আমি যদি এখন আমার নিজের জীবনটাকে সৃষ্টি করতে চাই? কেবল উপকরণের স্তূপ নয়, কেবল অলংকরণ নয়: নগ্ন, বিশুদ্ধ, উন্মুক্ত জীবন। স্ত্রী যখন যায় স্বামীর কাছে রাত্রির অন্ধকারে, রেখে

আসে তার সব অলংকার, যা দিয়ে সে পৃথিবীকে মুগ্ধ করে। সমস্ত পৃথিবী যাতে মুগ্ধ, একজনের পক্ষে তা যথেষ্ট হয়। সে তৃপ্ত হবে শুধু তাকে নিয়ে, তার সত্তার নগ্ন আর পবিত্র শুভ্রতা নিয়ে। সমস্ত সামাজিক পরিচয়ের আচ্ছাদন থেকে মুক্ত সেই নিগূঢ় মিলন! আমি তোমার জন্য উৎসুক, আমার সমস্ত রক্ত তোমার দিকে ঠেলে উঠছে। তুমি এসো আমার কাছে রাত্রির অন্ধকারে, রাত্রিকে আলোড়িত ক'রে, রাত্রিতে ঝড় তুলে দিয়ে। ঝড় উঠুক সমুদ্রে, রক্তের বিশাল, অন্ধকার সমুদ্রে: অন্য সব, অন্য সব-কিছু লুপ্ত হ'য়ে যাক সেই রক্তের উত্তপ্ত অন্ধকারে।

—কাল, কালই ওকে যেতে হবে, আরো একবার পাশ ফিরে অবিনাশ ভাবলে।

* * *

সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলো? ঠিক বুঝতে পারছে না। না; অনেক ছবি ভেসে গেছে তার বোজা চোখের অন্ধকারে, সে-সব স্বপ্ন নয়। ঘুমের মধ্যে আমরা ছবি দিয়ে ভাবি: তার নাম স্বপ্ন। অনেক সময় নিজেই বেশ বুঝতে পারি যে ছবিটা আমিই তৈরি করছি। স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই বুঝতে পারছি যে স্বপ্ন, তবু স্বপ্ন ভাঙে না। এইরকম হোক, আর তা-ই আমরা দেখি চোখের সামনে। স্বপ্নে কি আমরা স্বপ্ন দেখতে পারি? ধরো আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমি স্বপ্ন দেখছি যে আমি স্বপ্ন দেখছি···। এর কি কোনো মানে হয়?

ছেলেবেলায় সে কতদিন অবাক হয়েছে এ-কথা ভেবে। কলেজে তার সঙ্গে একজন পড়তো সে বলতো যে একই স্বপ্নের খানিকটা সে আজ দ্যাখে, কাল তার পরের অংশ, পরশু আরো খানিকটা—এমনি ক'রে, ধরো, আট-দশদিনে শেষ। মাসিকপত্রের ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো। মন্দ নয়। রোজ রাত্রিতে শোবার সময় মনে-মনে ভাবা: আজ রাত্রিতে কী হবে না জানি। বেশ মজা: ফাঁকির উপর খানিকটা মজা পাওয়া যাচ্ছে। বলে যে দিনের বেলায় আমরা যা ভাবি রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে তা-ই। বাজে কথা। সেদিন সে স্বপ্ন দেখছিলো একটা গির্জের সামনে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে, সেখানে তার গাড়ি গেছে আটকে। গির্জেটা অক্সফোর্ডের, রাস্তাটা কলকাতার। খানিক পরে কোত্থেকে ফিরিঙ্গি গোছের একজন লোক এসে তার কাছে দেশলাই চাইলে। দেশলাই সে দিলে, কিন্তু কিছুতেই সেটা জ্বলে না। তারপর আস্তে-আস্তে লোকটা হ্যামলেট হ'য়ে গেলো। বলতে আরম্ভ করলে, 'To be or not to be—' কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গাড়িটা হঠাৎ চলতে আরম্ভ করলো। সার্কুলার রোড ধ'রে সোজা এসে পৌঁছলো শেয়ালদায়। গাড়ি এক্ষুনি ছাড়বে। তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে সে জেগে উঠলো। পাগলামি! অক্সফোর্ডে এক ছোকরা ছিলো, স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা করতো। তাকে এটা আগাগোড়া বললে রূপকটা চমৎকার বুঝিয়ে দিতে পারতো নিশ্চয়ই। কিন্তু এই বোঝানোটাই আসল পাগলামি হয়তো। মনের নিরুদ্ধ কামনাই যদি হবে, শিশু স্বপ্ন দেখে কেন? কেউ কি জানতে পেরেছে শিশু কী স্বপ্ন

দেখে? ঘুমের মধ্যে সে হাসে, কাঁদে, চেঁচিয়ে ওঠে। কেমন ক'রে সেটা হয়, সে তো কিছুই জানে না। আমরা বলি পূর্বজন্মের স্মৃতি। ঠিক বছর চার-পাঁচ বয়স হবার সঙ্গে-সঙ্গেই কি সে-সব স্মৃতি মিলিয়ে যায়? স্বপ্নে থাকে হয়তো। বড়ো হ'য়েও স্বপ্নে থাকে। আমাদের যত সব অদ্ভুত, আজগুবি স্বপ্ন—পূর্বজন্মেরই সঙ্গে কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট হয়তো। বেশ একটা থিওরি খাড়া করা যায় ঐ গোছের। সাজিয়ে দাঁড় করাতে পারলে সমর্থন করবার লোকের অভাব হবে না। জন্মান্তরে বিশ্বাসটা ভারি আরামের, যা-ই বলো। মরবার সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে কিছু-না হ'য়ে যাবো, এটা মানুষের মন কোনো সময়ে কোনো দেশেই মানতে চায়নি। ও-লোকটা অন্ধ হ'লো কেন? গতজন্মের পাপ। এই জীবন ভ'রে কষ্ট পেয়ে গেলুম অবিশ্যি, কিন্তু পরজন্মে মিলবে এর পুরস্কার। জীবনকে সহ্য করতে সাহায্য করে, যা-ই বলো। হিন্দু বিধবা কেন বিনা প্রতিবাদে তার অদৃষ্টকে মেনে নেয়। জন্মান্তরে আবার তাকে পাবো। আমাদের বিবাহের এমনি শক্তি, মৃত্যুতে পর্যন্ত তার ছেদ হয় না। হিন্দু-স্ত্রী মরবার সময় প্রার্থনা করে: জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকেই পাই। ম'রে গিয়েও সে তার দখল ছাড়বে না। এই একটা জীবন নিয়েই সে তৃপ্ত নয়: চিরজীবন তার চাই, সমস্ত চিরকাল চাই তার। যদি একটু ফাঁক দেখা দেয় কোনোখানে, আতংকে সে আঁকড়ে ধরবে, আটকে রাখবে প্রাণপণে, প্রাণপণে; নিজেকে মেরে ফেলবে সেই নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক চেষ্টায়।

অবিনাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—আমি কি আজ ঘুমুতে পারবো না?

* * *

চারদিক চুপচাপ। কোনোখান থেকে একটু শব্দ এলেই সে যেন বাঁচতো। কতক্ষণ সে শুয়ে আছে বিছানায়? কে জানে। কখনো কি শেষ হবে এই রাত্রি? ঘুমে ভরা শহর, রাত্রির রাস্তাগুলো ঘুমে ভরা। সে জেগে-জেগে শুনছে সমস্ত শহরের নিঃশব্দ ঘুম। চারদিকে ঘুমের সমুদ্র, তার জন্য এক ফোঁটা নেই। কবে কোন অ্যালবাট্রস সে মেরেছিলো যার জন্য এই শাস্তি? এমনি ক'রেই সমস্ত রাত কাটবে নাকি? আর তার শরীর জ'মে গেলো ঠাণ্ডা একটা আতংকে। কবে কোন অ্যালবাট্রস আমি মেরেছিলাম! কী আশ্চর্য কবিতা—স্কুলের বইয়ে দিয়ে-দিয়ে তার জাত মেরেছে যদিও। O Sleep, it is a gentle thing. ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত দয়া করেছিলেন: বৃষ্টি নেমেছিলো, ঘুম নেমেছিলো। বলতে পারো কী করলে ঘুম আসে? যদি ভুলতে পারো, ঘুমোতে যে হবে সে-কথা যদি ভুলতে পারো। এর মধ্যে দু-একবার হয়তো তার চোখ জড়িয়ে এসেছে: সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়েছে 'এই—,' আর অমনি গেছে ছুটে। অথচ সে ক্লান্ত, এত ক্লান্ত। উঠে যে বসবে তা-ও পারে না। যদি ভুলতে পারতো, যদি নিজেকে ভুলতে পারতো। নিজের বাইরে কিছু

থাকতো যদি। তা-ই তো আমাদের জীবনের আনন্দ, আমাদের ঘুমের শান্তি। ছেলেবেলায় সে একবার অনেক খেটে-খেটে প্রায় তার হাঁটুর সমান উঁচু একটা দোতলা বাড়ি বানিয়েছিলো। বরিশালে তাদের বাড়ির সামনে ইট প'ড়ে ছিলো কতগুলো। সেই ইট দিয়ে দেয়াল, কাদার পলেস্তরা। বিকেলের রোদ্দুরে ব'সে-ব'সে মাটি ছানা। নিজের হাতে কিছু তৈরি করার সেই আনন্দ আর কি সে কখনো পেয়েছে? অনেকদিন তার লেগেছিলো শেষ করতে। কিছুতেই মনের মতো হয় না: বার-বার অদল-বদল করতে হয়। আর কিছুদিন পরেই সেই ফাঁকা জমিটুকু ভ'রে সেই ইটের স্তূপ দিয়ে সত্যিকার বাড়ি তৈরি আরম্ভ হ'লো: মাটিতে মিশে গেলো তার বাড়ি। সে তো যাবেই: কিন্তু র'য়ে গেলো তার সেই ভালো লাগা, এখনো মনে করতে ভালো লাগে। শোভার বড়ো ইচ্ছে ছিলো নিজের বাড়ি হবে, নিজের বাড়িতে থাকবে। যদি আমরা সারাজীবন নিজের হাতে খেলনা-বাড়ি তৈরি ক'রে আনন্দ পেতাম তাহ'লে মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়ে টাকা খরচ ক'রে নিজের বাড়ি তৈরি করার জন্য ছটফট করতুম না। কিছুদিন সে একটা কুকুর পুষেছিলো। একটা বাজে জাতের দো-আঁশলা বাচ্চা। তার অত্যধিক আদরেই বেচারা মারা গেলো বোধহয়। হঠাৎ সারা গায়ে কী-রকম পোকা উঠলো; রোদ্দুরে চোখ বুজে শুয়ে থাকে, কিছু খায় না, জোর ক'রে টেনে তুললে দু-পা গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। বাবাকে ব'লে পশুর ডাক্তার আনালে। কিছু হ'লো না। মরলো

কুকুর। একটু দূরে একটা ফাঁকা মাঠ, সেখানে নিয়ে তাকে সে কবর দিলে। স্থতো দিয়ে দুটো কাঠি বেঁধে বসিয়ে দিলে কবরের উপরে। নিজের বাইরে এ-সব ছোটোখাটো জিনিশে মগ্ন হ'য়ে যাবার ক্ষমতা কেন আমরা হারিয়ে ফেলি?

রাত ক-টা বাজলো? রাত ক-টা বাজলো?

* * *

ও যদি কাল চ'লে যায়, তারপর শান্ত হবে হাওয়া, চাপা বিদ্যুৎ আর হানা দেবে না, শান্ত হবে, শান্ত হবে, আর আমি ঘুমোতে পারবো, ঘুমোতে পারবো। ঝড় বুঝি ভেঙে পড়লো—বিদ্যুৎময় হিংস্র আকাশের দিকে চেয়ে ভয়ে কাঁপছি। ঝড় উঠলো না, ভয় গেলো কেটে, আকাশ স্বচ্ছ আর শান্ত, তরল নীল স্রোত। কেমন চুপচাপ হ'য়ে যাবো নিজের ভিতরে—ও চ'লে গেলে। ও যাবেই: নিজের মুখে ও বলেছে, আমি ওকে বলিয়েছি। যাও, আমার কাছ থেকে যাও: আমি ভয় করিনে। ওকে যে ফিরে আসতেই হবে। ও কি তা জানে না? জানে, জানে। তাই তো ওর চোখের কোণে ছায়া লাফিয়ে উঠছে থেকে-থেকে, আর তাই তো ওর কালো চুল রাত্রির শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো, আর তাই তো ও এমন ম্লান আর এমন নরম—সায় দেয়, মেনে নেয়, প্রতিবাদ করে না, বিদ্রোহ করে না। জানে, জানে। ভয় নেই ওরও। যে-মেয়ে জানে শুধু সে-ই পারে অমন নরম হ'তে, আনত

হ'তে, অমন সহজে মেনে নিতে। আর ছায়া লাফিয়ে উঠছে ওর চোখে, ছায়া। আর ওর চুল। ওর চুল, আর ওর বাঁকানো ঠোঁট, আর ওর দীর্ঘ, শুভ্র বাহুর অস্পষ্ট ঝিলিমিলি অন্ধকারে। দেবতা, আমাকে দাও ওকে। আমার দিকে ওকে পাঠাও, আমার দিকে। ওকে থামতে দিয়ো না, যতক্ষণ না আমার কাছে এসে পৌঁছয়। ওকে যেন আসতেই হয় আমার কাছে। আমার দিকে ওর মুখ ফেরাও, আমার দিকে। আমার কাছে ওকে টেনে আনো। ও যে কাল চ'লে যাবে তা ফিরে আসবে ব'লেই। ফিরে আসবে—তারপর আর চ'লে যাবে না।

কী? পাখি ডাকছে বাইরে? ভোর হ'লো নাকি? না কি চাঁদ উঠেছে বুঝি, ভূতুড়ে আলো ফেলেছে, বোকা পাখি ডেকে উঠছে তা-ই দেখে। বোকা, বোকা পাখি। ঘরের মধ্যে চড়ুই বাসা বাঁধে, হঠাৎ রাত্রে যদি আলো জ্বালি অমনি চেঁচিয়ে ওঠে, খুশিতে পাখা ঝাপটায়। ভোর হ'লো, ওরা ভাবে বুঝি। সত্যি, ভোর হ'লো না তো? ঘুমোতে পারবো না, আজ আর আমি ঘুমোতে পারবো না। ঠাণ্ডা ঘামে তার শরীর ভিজে উঠলো। শুয়ে আছি কেন? উঠলেই তো হয়, উঠে চ'লে যাক ময়দানে, গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসুক। ভোরের হাওয়া লাগবে গায়ে। দূর হবে ক্লান্তি। একটু রুটি একটু মাখন নইলে বাঁচা দায়, ভোরের বায়ু প্রাণটা আমার ঠাণ্ডা ক'রে যায়। হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় ব'সে দুলে-দুলে সে পদ্য পড়ছে। দেয়ালে মস্ত ছায়া পড়েছে তার। তার ভয় করতো, নিজের

সেই মস্ত ছায়াকে কেমন ভয় করতো। মনে হ'তো মৃত্যু সব সময় তার পিছনে তীর লক্ষ্য ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, যেদিকেই ফেরে সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক তার পিছনে, তাকে এড়াবার উপায় নেই। সব সময় তো একটা পিছনের দিক থাকতেই হবে, কিছুতেই সেটা বাদ দেয়া যায় না। মৃত্যু কানে-কানে ধনুক টেনে ঠিক তাক ক'রে আছে: এখন যে ছাড়ছে না সেটা তার মরজি। যখন খুশি হবে ছাড়বে। মৃত্যু দেখতে অনেকটা প্রোফেসর ঘোষের মতো। তীরন্দাজ প্রোফেসর। আশ্চর্য কতগুলো খেলা দেখিয়েছিলো। সে প্রায় ম'রে গিয়েছিলো বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়। কিছুদিন তার জীবনে তীরের খেলা ছাড়া আর-কিছু ছিলো না। সরু সুতোয় বল ঝুলিয়ে সেটাকে কাটা। উচ্চাশা ছিলো দ্বিতীয় প্রোফেসর ঘোষ হবে। এমনি কত উচ্চাশা থেকেই আমরা স্খলিত হই জীবনে। আর মৃত্যুর সেই মূর্তি, সোজা তার দিকে তীর লক্ষ্য ক'রে আছে। তার পিছনে, সব সময়ে তার পিছনে। আমাদের সকলের পিছনে। সব সময় আমাদের সকলের পিছনে। এখন যে মারছে না সেটা তার মরজি। খুশি হ'লেই মারবে।

ঘামে ভেজা হাতের তেলো চাদরে ঘ'ষে মুছলো। তাকিয়ে দেখলো, অন্ধকার কি ফিকে হ'য়ে আসছে? বোঝা যায় না। নিঃশব্দ, নীরন্ধ্র রাত্রি। চিরন্তন রাত্রি: তার সমস্ত অতীত গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো তার চাপে। কতকাল আর প'ড়ে থাকবে এই দুঃস্বপ্নের গহ্বরে? সে উঠবে, উঠে রাস্তায় বেরোবে, ভোরের রাস্তায়। কতকাল সে ভোর ছাখে না। অন্ধকার কেঁপে-

কেঁপে স'রে যাচ্ছে। রাত্রি এসে যেথায় মেশে। কতকাল সে ভোর ছাখে না। আটটার আগে কবে সে উঠেছে। সেই এক-একদিন মণি আসতো তার হস্টেল থেকে ভোরবেলায়। সবে ভোর হয়েছে, রোদ ওঠেনি। অবি-দা, ওঠো। এই, ওঠো, ওঠো। হালকা, হাসিখুশি ওর স্বর ঘুমের মধ্যে ঢেউ-খেলানো। চোখ মেলে দেখতো ওর তরুণ, উৎসুক মুখ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। তোমার কি মনে পড়ে সেই ভোরবেলায় তুমি এসে আমার ঘুম ভাঙাতে, বসতে শিয়রের ধারে, আর আমি ঘুম-ভাঙা চোখে তাকাতুম তোমার দিকে, অলসভাবে হাত-পা টান ক'রে আবার চোখ বুজতুম, আর তুমি হাসতে আর ডাকতে ওঠো ওঠো। আর তুমি টানতে আমার চুল ধ'রে আর তোমার আঁচল খ'সে পড়তো আমার মুখের উপর আর বিছানার পাশে টিপয়ের উপর একটা ফুলের তোড়া তুমি নিয়ে এসেছো। আর সন্ত-জল-ঢালা রাস্তার গন্ধ, আর ময়দানের শিশির-ভেজা ঘাসের গন্ধ আর সাহেবদের ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করছে আর তুমি হাসছো আর আকাশের নীল পেয়ালা ফেটে আলো উপচে পড়ছে। আর হলদে রোদে ভ'রে যাওয়া সেই ঘর আর শোভা বলছে সন্ধ্যা তুই চা-টা ঢেলে ফ্যাল আর ঝকঝকে শাদা পেয়ালাগুলো আর টোস্টরুটির গন্ধ আর ফুলের তোড়ার সেই হালকা গন্ধের নিশ্বাস। তোমার কি মনে পড়ে? তোমার কি মনে পড়ে? তোমার কি—

অবিনাশ যেন চমকে চোখ মেলে তাকালো। পাথরের মতো

ভারি রাত্রি, পাথরের মতো স্তব্ধ। নিশ্বাস পড়ে না যেন। আর-কিছু নেই, এই রাত্রি ছাড়া কোনোখানে আর-কিছু নেই। চূর্ণিত, নিষ্পেষিত হ'য়ে গেলো সব। কলকাতা কি এখনো আছে? এখনো কি আছে চৌরঙ্গি আর ইলেকট্রিক কোম্পানির ভিক্টরিয়া হাউস আর তীরের মতো সোজা আর সরু বৌবাজার আর হাওড়ার পুলের নিচে ঘোলাটে গঙ্গা? কলকাতা কি আছে? সে কি কাল আবার যাবে ইউনিভার্সিটিতে, শেক্সপিয়র পড়বে, শেলির প্রথম স্ত্রীর জীবন-চরিত আলোচনা করবে? এ কি বিশ্বাস করা যায় যে কাল সকালে আবার রাস্তায় ট্র্যাফিকের স্রোত, ভদ্রলোকরা পান চিবোতে-চিবোতে আপিশের দিকে ছুটবেন, সেই গরম আর ধুলো, আর গোলমাল, আর কলেজ স্কোয়ারের পুকুরের জলে ওপারের বইয়ের দোকানগুলোর ছায়া? শূন্য, এই রাত্রির অপরিসীম একটা শূন্যতা, যার মধ্যে জ্বলছে তার রক্ত দপদপ ক'রে, দপদপ ক'রে জ্বলছে তার কপালের দু-দিকে, জ্বলছে—

দয়া করো, রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে যারা ঘুমোতে পারে না, তাদের দয়া করো দেবতা।

* * * *

তার আঙুলের মৃদু একটু চাপে সমস্ত ঘর ভ'রে আলো জ্ব'লে উঠলো। বিস্রস্ত চাদর, বিধ্বস্ত বালিশ। এক লাফে সে নামলো বিছানা থেকে। আলোয় উদ্ভাসিত এই ঘরের পুরোনো, পরিচিত

চেহারা তাকে আশ্বাস দিলে। পায়ের নিচে মাটি ঠেকলো যেন। এই তো তার ঘর, ঘরের জিনিশপত্র, বই। সব যেমন ছিলো, তেমনি আছে। ঘড়িতে দুটো বেজে কুড়ি মিনিট। মোটে? চটিতে পা ঢুকিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বারান্দা পার হ'য়ে গেলো বাথরুমে। কল ঘুরিয়ে দিতেই অনেকক্ষণ ধ'রে রুদ্ধ স্রোত ভসভস ক'রে বেরিয়ে এলো। খুব বেশি রাত্রে একবার জল আসে। কার সুবিধের জন্য? সাহেবদের বোধ হয়: তারা শোবার আগে একবার স্নান করে। না কি মজুরদের বস্তিতে কাজে লাগে? কলের নিচে সে মাথা পেতে দিলে। জল গড়িয়ে গেলো, লাফিয়ে গেলো তার ঘন চুলের উপর দিয়ে। দু-হাতে জল নিয়ে মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিলে, ঘাড়ে, গলায়। তার ঢিলে জামার ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়লো পিঠে, মেরুদণ্ডের লম্বা গর্ত দিয়ে বেয়ে পড়লো। মুখের উপর ঝুলে-পড়া ভিজে লম্বা চুলগুলো সরিয়ে-সরিয়ে দিতে লাগলো হাত দিয়ে। কপালটা গরম, জ্বরের মতো। চুলগুলো দু-হাতের মধ্যে ধ'রে মুচড়িয়ে-মুচড়িয়ে সে জলটা তার খুলির উপর পড়তে দিলে। আ—অনেক ভালো লাগছে এখন। সে গিয়ে টেবিলে বসবে: মাইনর এলিজাবিথানদের উপর একটা নোট তৈরি করবে। বাজে কাজ করবার এমন সুযোগ জীবনে বেশি আসে না। বাজে? যে-কোনো, যে-কোনো কাজ, যাতে অন্যমনস্ক হ'তে পারবো, ভুলতে পারবো। বর্টাণ্ড রাসেল একজনের কথা লিখেছেন: স্ত্রীর মৃত্যুর পরে

চীনেভাষা শিখতে আরম্ভ ক'রে সে আত্মরক্ষা করে। আর সেই জর্মান বন্দীর গল্প : একটা অন্ধকার কুঠুরিতে প্রায় চার বছর একা কাটিয়ে দেয়। পকেটে ছিলো চারটে আলপিন, সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে আবার অন্ধকারে খুঁজে-খুঁজে বের ক'রে-ক'রে। বেরিয়ে যখন এলো, কোনোরকম গোলমাল হয়নি মাথার। আশ্চর্য, ভাবতে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। মাথা মুছতে-মুছতে সে আয়নার দিকে তাকালো। ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। লালচে চোখ। দিনের বেলা তাকে কেমন রং-ওঠা গোছের দেখাবে। আর কাল অনেক অনেক কাজ : নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে, সন্ধ্যামণিকে তুলে দিয়ে আসতে হবে স্টেশনে। ইউনিভার্সিটিতে যদি না যায়, দিনের বেলা একটু ঘুমোতে পারবে হয়তো।

বাথরুমের আলো নিবিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এলো। বারান্দায় বেশ ঠাণ্ডা, একটু শিরশির করে। অন্ধকারের ঘন বুনোনে গ্যাসের বাতিগুলো মাঝে-মাঝে গর্ত ক'রে দিয়েছে। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার : শোভার ঘরের নীলচে আলোও বোধহয় নেবানো। যে জেগে আছে তার কাছে কী অদ্ভুতই লাগে—ঘুমে আর অন্ধকারে ভরা এই বাড়িঁ। রাস্তার দু-দিকে সারি-সারি বাড়ি : জীবনের নাটকের উপর যবনিকা ফেলা। হঠাৎ হয়তো কোনো শিশু কেঁদে উঠলো। বিড়াল নিঃশব্দে চলাফেরা করে। ভীরু ইঁদুর বাসন-কোসনের ফাঁক দিয়ে তীরের মতো ছুটে পালায়। আর রটারিযন্ত্রের বিরাট গহ্বর হাজার-হাজার প্রকাণ্ড কাগজ উদ্গীরণ করছে : আর একঘণ্টার মধ্যে আমাদের জন্য আজকের খবরের কাগজ তৈরি হ'য়ে যাবে।

অন্ধকারে সে কয়েক পা এগিয়ে এলো। মনে হচ্ছে এখন শুলে ঘুম আসবে। কিন্তু দুঃসাহসে দরকার নেই। সে বসবে, ব'সে মাইনর এলিজাবিথানদের সম্বন্ধে নোট তৈরি করবে। ঠিক ভোরবেলায় গিয়ে শোবে: সন্ধ্যামণি যেন দেখতে না পায় সে জেগে ব'সে আছে।

আর তারপর, কোণের ছোটো ঘরটার সামনে সে থমকে দাঁড়ালো। দরজাটা খোলা, ভিতরে তাকিয়ে প্রথমটায় সে কিছুই দেখতে পেলো না; একটু পরে সে বুঝতে পারলে মেঝের উপর সন্ধ্যামণি শুয়ে আছে।

—'মণি,' হঠাৎ সে নিজেকে ডাকতে শুনলো।

ঝেঁকে ন'ড়ে উঠলো এলায়িত, শিথিল শরীর। অন্ধকারেও যেন অবিনাশ বুঝতে পারলে ওর চোখ চমকে মেলে গেলো।

'তুমি ঘুমোওনি?'

কোনো উত্তর এলো না।

অবিনাশ ঘরের ভিতরে দু-এক পা এগিয়ে গেলো।—'এই মেঝেতে শুয়ে আছো কেন? দস্তুরমতো ঠাণ্ডা লাগবে!'

তবু কোনো উত্তর নেই।

'ওঠো, বিছানায় শোওগে।'

অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে অদ্ভুত চাপা শব্দ উঠে এলো।

'ওঠো না!' অবিনাশ নিচু হ'য়ে তাকে হাতে ধ'রে তোলবার চেষ্টা করলো।

আর হঠাৎ তার পায়ের উপর ছুটো দীর্ঘ বাহু জড়িয়ে গেলো, আর বৃষ্টির মতো নেমে এলো চুল। 'আমাকে দয়া করো, আমাকে দয়া করো,' বলতে-বলতে সন্ধ্যামণি অবিনাশের পায়ের উপর মুখ চেপে ধরলো। অবিনাশের পা চোখের জলে পুড়ে গেলো।

৪

'সন্ধ্যা, কাল রাত্রে আমি খুব ছটফট করেছিলুম ?'

'না, বৌদি। বেশ ভালোই তো ছিলে।'

'কী জানি, ভালো ক'রে মনে পড়ছে না। আমার মাথার ভিতরটা আজ কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'চুপ করো, বৌদি।'

'চুপ করলে কী-সব আবোল-তাবোল মনে পড়ে। সন্ধ্যা!'

'কী, বৌদি ?'

'আজ সকালে ডাক্তার কী ব'লে গেলো জানিস্ ?...চুপ ক'রে আছিস কেন ? বল না।...থাক, না বললি। তোরা কি ভাবছিস আমি বুঝতে পারি না ?'

সন্ধ্যামণি হাত-পাখা নিয়ে আস্তে-আস্তে মাথায় হাওয়া করতে লাগলো।

'পাখা রাখ। তুই একটু নেমে বোস্, সন্ধ্যা; তোর মুখ দেখতে দে।'

তবু সন্ধ্যামণি হাওয়া করতে লাগলো।

'শুনতে পাসনে কথা ? বলছি তোকে—'

সন্ধ্যামণি পাখা রেখে দিয়ে শোভনার পাশে নেমে বসলো।

'তোর চেহারা খারাপ হ'য়ে গেছে, সন্ধ্যা। এমন সুন্দর—না, না, এতে লজ্জা কী? কী সুন্দর তুই, তা তুই কেমন ক'রে জানবি?'

'বৌদি, বেশি কথা বোলো না।'

'ডাক্তার বারণ করেছে বুঝি? কিন্তু ডাক্তারের কথা মেনে চলবার আর কি সময় আছে!'

একটু চুপ ক'রে থেকে শোভনা আবার বললে, 'এ-বয়সে এমন ক'রে চেহারা নষ্ট করা তোর উচিত নয়। তোকে না আমি বলেছিলুম হস্টেলে ফিরে যেতে?'

'যাবো, বৌদি।'

'কবে? শোন, তুই আজই চ'লে যা। তোর অবি-দা বুঝি যেতে দিতে চান না?'

'আমিই যেতে চাইনা, বৌদি।'

'কেন? তোর পরীক্ষা না কাছে? না কি তাও দিবি না?'

'দেবোই না তা তো ঠিক করিনি।'

'না কি এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে? বল, আমার কাছে লজ্জা করিসনে।'

'অন্য রকম মানে?'

'মনে হচ্ছে কি—এই পাশ করা ছাড়াও বড়ো জিনিশ আছে মেয়েদের জীবনে?' বলতে-বলতে অদ্ভুত হাসিতে শোভার রুগ্ন মুখ যেন আরো কুৎসিত দেখালো।

সন্ধ্যামণি মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার নিশ্বাস দ্রুত হ'য়ে উঠলো, চেষ্টা ক'রে চাপা দিলে সেটাকে।

শোভনা আবার বললে, 'এখন বোধ হয় বুঝেছিস যে শুধু পড়াশুনো ক'রে মেয়েদের প্রাণ বাঁচে না।'

'কারো প্রাণই বাঁচে না, বৌদি।'

'কারো প্রাণই বাঁচে না? কী ক'রে বুঝলি তুই?'

সন্ধ্যামণির কপাল ঘেমে উঠলো।

'কী ক'রে বুঝলি?' শোভনা কী-রকম অদ্ভুত, বিকৃত শব্দ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর সেই হাসির ধাক্কায় ক্লান্ত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ।

'সন্ধ্যা, আমি কি তোকে চাবিগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি?'

'চাবিগুলো?'

'ঐ যে হাতবাক্সটা, যার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো আর চুলের কাঁটা, সেখানে আছে। নিয়ে আয়।'

'এখন কী হবে এনে?'

'না, এখনই আন। কখন জ্ঞান চ'লে যায়—'

'বৌদি, তুমি যদি এ-সব কথা বলো তাহ'লে আমি এখান থেকে চ'লে যাবো।'

'দ্যাখ সন্ধ্যা, আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না, একটুও কোনোরকম কষ্ট হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমি চিরকাল জেগে থাকতে পারি।'

সন্ধ্যামণি সরু দৃষ্টিতে শোভনার দিকে একবার তাকালো। শোভনা সে-দৃষ্টি ধ'রে ফেললে:

'কী দেখলি বল তো?'

'একটা ওষুধ খাও এখন।' ডাক্তার একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলো, বেশি ছটফট করলে সেটা দিতে হবে। শোভনা কী ক'রে তা আঁচ করলে :

'ওষুধ খাইয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে চাস্? থাক না, যতক্ষণ জ্ঞান থাকে থাক না।'

'বৌদি, তুমি এ-রকম ভেঙে পড়লে কেন আজ?'

'আর ঠেকিয়ে রাখা গেলো না।'

'ডাক্তার বললে চেঞ্জে নিয়ে গেলেই—'

'চেঞ্জই তো। সবচেয়ে বড়ো চেঞ্জে যাচ্ছি আমি?'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

'সন্ধ্যা, উনি আজ কখন ফিরবেন জানিস?'

'অবি-দা তো আজ কলেজে যাননি।'

'যাননি?'

'না। তাঁকে ডাকবো?'

'না, না, ওঁকে ডেকে কী হবে। তুই বোস এখানে।'

'কিন্তু আর কথা বোলো না, বৌদি।'

'এ ছাড়া আর কি কোনো কথা তুই জানিসনে? শোন: আজ আমার ভারি অদ্ভুতরকমের ভালো লাগছে। কোনো কষ্ট আর নেই। আমার মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমার জ্ঞান থাকবে। যাদের ও-রকম হয়, তাদের নাকি অনেক পুণ্য।'

'ও-সব ছাইভস্ম ভাবছো কেন? তুমি তো ভালো হ'য়েই উঠছো।'

'সন্ধ্যা, আজ মনের কথা বল, আজ মনের কথা বলতে দে। নিজের মনটাকে আজ একেবারে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যা, আমি ভুল করেছিলুম।'

'ভুল কখনো করিনি, এমন কথা কে বলতে পারে ?'

'না, না, ও-রকম নয় ; আসল জায়গায় ভুল। পুরুষমানুষের কতটা যে প্রয়োজন তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু তুই-ই বল, সে কি আমার দোষ ? আমি যা পারি তার বেশি আমি পারতুম না। তার বেশি ভাবতেও পারতুম না।'

'যা পারি, সেটুকু প্রাণ দিয়ে করতে পারাই কি কম কথা !'

'কিন্তু এত ক'রেও অদৃষ্টকে খুশি করতে পারলাম কই।'

'ও-কথা কেন বলছো, বৌদি ?'

'না, পারিনি ! আর তোরই কাছে আমাকে তা শিখতে হ'লো !'

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগলো সন্ধ্যামণির বুকে, তার নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

'তুই বুঝেছিলি—আসল প্রয়োজনটা কোথায় তুই তা জানতিস। আর সেইজন্যই তো বিধাতা শেষ পর্যন্ত তোকেই জিতিয়ে দিলেন।'

সন্ধ্যামণির হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে যেন তাকে গলা টিপে মারতে চাইলো।

'কিন্তু আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে এ-রকম হবে। শেষ পর্যন্ত আমার আশা ছিলো—কাঁদিসনে, সন্ধ্যা।'

সন্ধ্যামণি চোখ তুলে শোভনার দিকে তাকালো।—'না, আমি কাঁদছিনা তো।' অতি কষ্টে উচ্চারণ করলো সে।

শোভনা মুহূর্তকাল সন্ধ্যামণির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে ব'লে উঠলো: 'কী দেখছিস তুই, আমার দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে কী দেখছিস?'

সন্ধ্যামণি চোখ নামিয়ে নিলে।

'চুপ ক'রে আছিস কেন? বল না। কী লুকোতে চাস তুই আমার কাছ থেকে?'

সন্ধ্যামণির বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠলো তপ্ত, শক্ত কান্না। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

'সন্ধ্যা, এখন তোর বিয়ে হ'লে মানায়।'

সন্ধ্যামণি নিচের ঠোঁটটা কামড়ে প্রায় রক্ত বের ক'রে ফেললো। সে কি চ'লে যেতে পারে না, এখান থেকে চ'লে যেতে পারে না? এ তাকে সইতেই হবে কেন, এই অত্যাচার, মুমূর্ষুর এই অন্ধ দৃষ্টি, মৃত্যুর এই অন্ধ শক্তি, ঠাণ্ডা হিমস্পর্শ? যে-কষ্ট সে পাচ্ছে তা কি যথেষ্ট নয়, তা কি যথেষ্ট নয়? ছুটে বেরিয়ে যেতে পারতো যদি, চ'লে যেতে পারতো যদি। কিন্তু কী যেন তাকে টেনে রাখছে, আঁকড়ে ধ'রে রাখছে, প্রেত-শক্তি, অপরাজেয় প্রেত-শক্তি, স্পর্শাতীত, অপরাজেয়। মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে শোভনাকে সে ঝাপসা একটু দেখে নিলে। আর তার মনে হ'লো যে শোভনা ম'রে গেছে, কখন তাদের অজ্ঞাতে, কাউকে কিছু বুঝতে না-দিয়ে ম'রে গেছে—আর এখন তার প্রেত এই শাদা বিছানায় প্রসারিত, তার চোখে প্রেতের ভয়ংকর নির্নিমেষতা, আর তার ঠাণ্ডা প্রেত-আঙুল সে বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, তার চিরন্তন নিঃসঙ্গতা

থেকে ধরতে চাইছে তাকে, ধ'রে রাখতে চাইছে। আর সন্ধ্যামণি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো : স্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস।

'আমি সেই তখনই তোকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, উনি যখন বিলেত থেকে ফিরে এলেন,' শোভনা বলতে লাগলো। 'আমারই ভুল হ'লো, তখন আমি জোর করলুম না। যা-ই বল না, মেয়েদের বিয়ে না-হ'লে তারা করবে কী? সত্যি ক'রে বল, এ-সব পাশ-টাশ ক'রে তুই কি শান্তি পেয়েছিস?'

সন্ধ্যামণি কিছু বলবার চেষ্টা করলে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না।

'তাহ'লে যা না, যা না তোর হস্টেলে ফিরে, এখানে খেটে-খেটে মরছিস কেন? বড়ো না বিদুষী হবার জন্যে পণ করেছিলি? তা তোকে কেমন বাঁচায় দেখি না!—কিন্তু তোকে যে কিছু বলবো সে-পথও তুই আজ বন্ধ করেছিস। যা-কিছু তোর জন্যে করেছি এমন ক'রে শোধ করলি তুই—আমায় কিনে রাখলি একেবারে। ঈশ্বর তোর পক্ষ নিয়েছেন—কে কী করবে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে শোভনা জোরে-জোরে কয়েকবার নিশ্বাস নিলে।

'না, আমারই দোষ। আমারই বোঝা উচিত ছিলো। কেমন ক'রে পুরুষের মন পেতে হয়, আমি তা জানতুম না। ওদের খিদেটা মস্ত : অনেক-কিছু লাগে তা মেটাতে। কিন্তু আমি ছিলুম নিশ্চিন্ত হ'য়ে : মনে-মনে জানতুম বিয়েই তো যথেষ্ট। কিন্তু বিয়ে তো সব নয়, বিয়ে যথেষ্ট নয়। বিয়ে মোটে আরম্ভ,

আসল হার-জিৎ তার পরে। আমি তা জানতুম না, সেইজন্যেই বিধাতা এমন শাস্তি দিলেন।'

শোভনা আবার একটু চুপ করলো, জিরিয়ে নিলো, তারপর :

'সন্ধ্যা, তুই চুপ ক'রে আছিস কেন? কী ভাবছিস? আমার দিকে তাকাতে পারিসনে? আমার দিকে তাকাতে কি তোর ভয় করে?' শোভনা হঠাৎ বালিশ থেকে মাথা তোলবার চেষ্টা করলো, পাৎলা শেমিজের নিচে যেন কেঁপে উঠলো তার কঙ্কাল। 'তুই ব'সে আছিস কেন এখানে—যা, চ'লে যা, মরতে দে আমাকে। ওরে ডাইনি, তুই ওৎ পেতে ব'সে আছিস—কিন্তু সইবে না, সইবে না, কাঁটা হ'য়ে ফুটবে, জ্ব'লে-পুড়ে মরবি—এই আমি শাপ দিলুম।'

বলতে-বলতে শোভনা বালিশের উপর কাঁধের ভর রেখে অর্ধেক উঠে বসলো, কপালে গিয়ে ঠেকলো তার চোখ, গলার ভিতরটায় ঘড়ঘড় আওয়াজ হ'তে লাগলো, ফেনার বুদ্বুদ উঠতে লাগলো মুখ দিয়ে।

সন্ধ্যামণির কণ্ঠনালী ছিঁড়ে চীৎকার বেরিয়ে এলো : 'যশোদা! যশোদা! তোর বাবুকে ডেকে আন—শিগগির।'

ব'লে সে নিজেই ছুটে বেরিয়ে গেলো, অন্ধ, নিশ্চেতন ভয়ের উন্মত্ততায়; যেখানে অবিনাশ গতরাত্রির অনিদ্রার পরে ঘুমুচ্ছিলো, খাটের উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো, 'অবি-দা, অবি-দা!'

অবিনাশ কাঁচা ঘুমের মধ্যে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো।—'কী? কী? হয়েছে কী?'—কিন্তু কী, তা তো আমি জানি।

'তুমি যাও—ও-ঘরে একটু যাও।' এ-কথা ব'লে সন্ধ্যামণি প্রাণপণে অবিনাশকে জড়িয়ে ধরলো। থরথর ক'রে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর, মাঝে-মাঝে তার দাঁতে দাঁত লেগে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'আমাকে—এখান থেকে পাঠিয়ে দাও,' অদ্ভুত ভাঙা-ভাঙা গলায় সে বললে।

অবিনাশ ওর ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখ আর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বুঝলো। সন্ধ্যামণি আবার বললে, 'আমাকে পাঠিয়ে দাও, এখানে থাকলে আমি আর বাঁচবো না।' ব'লে চোখ বুজলো।

সন্ধ্যামণিকে একটু শান্ত ক'রে শুইয়ে রেখে অবিনাশ শোভনার ঘরে এলো। শোভনার শরীরটা বিছানার মধ্যিখানে তাল পাকিয়ে আছে, জট-পাকানো পাটের মতো তার চুল এখনই যেন উঠে আসবে মাথা থেকে। তার চোখ বোজা, তার ঠোঁটের কোণে খানিকটা ফেনা শক্ত হ'য়ে জ'মে আছে।

অবিনাশ তার সেই অতি হালকা শরীর সন্তর্পণে তুলে বালিশে মাথা রেখে শোয়ালো, একটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলে গলা অবধি। শান্ত হ'য়ে সে শুয়ে রইলো, যেন ঘুমিয়ে আছে।

তারপর অবিনাশ কয়েকটা টেলিফোন করলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কর্নেল গাঙ্গুলি এসে পড়লেন, সঙ্গে আরো দু-জন ডাক্তার। এলো দু-জন শাদা পোশাক-পরা মোটাসোটা নার্স।

অন্য দু-জন ডাক্তার যখন ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করছেন, কর্নেল গাঙ্গুলি জিগেস করলেন :

'কিছু হয়েছিলো ?'

'কী আর হবে।'

'হঠাৎ এ-রকম অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন। মনের কোনোরকম উত্তেজনা—'

'কর্নেল গাঙ্গুলি, মনের উত্তেজনার উপর কার হাত আছে ?'

'ওঁকে আপনারা কথা বলান নি আশা করি।'

'উনি যদি কথা বলতে চান তো বলতে দিন না।'

কর্নেল গাঙ্গুলি কঠিন স্বরে বললেন, 'দেখুন, এ-রকম হতাশ হ'য়ে পড়লে কোনোরকম চিকিৎসা চলে না। আপনাকে আমি বলছি এখনো আশা আছে।'

'আশা আছে !' অবিনাশ মূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করলো।

'অন্তত, আজ সকালেও যা দেখে গিয়েছিলুম—কিন্তু এই ব্যাপারের পর কী-রকম হয় তা অবশ্য বলতে পারিনে।'

'কী আবার হবে,' অবিনাশ মরা গলায় বললে।

কর্নেল গাঙ্গুলি অবিনাশের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন : 'এ-রকম দুর্বলতা আপনাকে মানায় না, মিস্টর রায়।'

'কী করবো, মানুষের মন দুর্বল।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশা করতে হবে বইকি। দেখুন, এটা হয়তো কিছুই নয়—আপনি কি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন?'

'না, ভয় পাইনি।'

'অবশ্য অন্য কোনো রোগী এ-ধাক্কা সামলাতে পারতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু আপনার স্ত্রীর আশ্চর্য ভাইট্যালিটি। Wonderful! Wonderfully sound heart. আমার বরাবর অবাক লেগেছে এই ভেবে যে এমন একটা শক্ত ব্যামো তাঁর হ'তে পারলো।'

'কর্নেল গাঙ্গুলি, পৃথিবীর সুস্থতম লোকেরও চিরকাল বেঁচে থাকবার উপায় নেই।'

'মিঃ রয়, আপনি যদি মনটা একটু শক্ত করতে পারেন তাহ'লে আমরাও উৎসাহ পাই। সন্ধ্যার মনের জোর অনেক বেশি। তাকে আজ দেখছি না যে?'

'আমি তাকে আজ ছুটি দিয়ে দিয়েছি। নার্স আনালুম।'

'নার্স আনিয়েছেন ভালোই, কিন্তু সন্ধ্যারও কাছে থাকা দরকার।'

'ওর শরীরে আর দিচ্ছে না।'

'দেখুন, নীরোগ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার এখন সময় নয়। আপনি ওকে ডেকে পাঠান।'

'ও এখন ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাকতে পারবো না।'

কর্নেল গাঙ্গুলি একটু চুপ ক'রে রইলেন।

'এটা কি ঘুমোবার সময়?—দেখুন, আপনার স্ত্রী এতদিন

ধ'রে সন্ধ্যার উপরেই নির্ভর করেছেন, এখন ওর ঘুমিয়ে থাকাটা ভালো দেখায় না। কিছু মনে করবেন না—আমরা ডাক্তার মানুষ, স্পষ্ট কথা না-বললে আমাদের চলে না।'

অবিনাশ বললে, 'অন্য কিছু ব্যবস্থা করলে হয় না? না-হয় আর-একজন নার্স—'

'আর নার্স দিয়ে কী হবে? সন্ধ্যা কাছে থাকলে রোগীর মন ভালো থাকে, সেইজন্য বলছি। আমি ডাক্তার হিশেবে বলছি, এ-সময়ে ওর কাছে থাকা দরকার।'

'ক্ষমা করবেন। আমি ওকে আর রোগীর ঘরে ঢুকতে বারণ ক'রে দিয়েছি।'

কর্নেল গাঙ্গুলি তাঁর বিরক্তি গোপন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা করলেন না।

'এতদিন ধ'রে এত করবার পরে ঠিক এই সময়ে কি ওর শরীর আর পেরে উঠলো না?'

'অন্য কোনো ব্যবস্থাই কি যথেষ্ট নয়, কর্নেল গাঙ্গুলি?'

'আমার যা বলবার বলেছি। এখন আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন,' ব'লে কর্নেল গাঙ্গুলি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ইনজেকশন দেবার একটু পরে শোভনার জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলে একবার তাকালো: তার দৃষ্টিতে মৃত্যুর শূন্যতা। তারপর আবার চোখ বুজলো।

'আমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই বোধ করি,' অবিনাশ চুপি-চুপি বললে।

কর্নেল গাঙ্গুলি তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলেন

'আপনি বরং আশে-পাশে কোথাও থাকুন। আপনার যে-রকম দেখছি, নিজেকে সামলাতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। সেটা ভালো নয় রোগীর পক্ষে।'

'আমি বাইরেই থাকবো,' বললো অবিনাশ।

কর্নেল গাঙ্গুলির লালচে মোটা আঙুল তাঁর পকেটঘড়ির মোটা সোনার শিকল নিয়ে একটু খেলা করলে।

'রাত্রে একজন ডাক্তার থাকা দরকার মনে করেন?'

'সে তো আপনিই বলতে পারবেন।'

'আজকের রাতটা ভালোই কাটবে। আর হঠাৎ কিছু হবে না— এটা ঠিক। Wonderful heart. দরকাব হ'লে আমাকে ফোন করবেন। Any time of the night.'

হঠাৎ অবিনাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললে:

'কর্নেল গাঙ্গুলি: আর কতদিন?'

কর্নেল গাঙ্গুলির ছোটো-ছোটো নীলচে চোখ দয়ায় নরম হ'য়ে এলো:

'Don't lose heart, don't lose heart.'

অবিনাশ তার বিস্রস্ত ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে চুপ ক'রে রইলো।

যাবার আগে কর্নেল গাঙ্গুলি আর-একবার বললেন: 'সন্ধ্যার সঙ্গে একটু কথা ব'লে যাই।'

'ও ঘুমুচ্ছে,' অবিনাশ কঠিনভাবে বললে।

কর্নেল গাঙ্গুলি একটু চুপ ক'রে রইলেন :

'দেখুন, আপনার মনের ভাবটা বুঝতে পারছিনে। আপনি কি ওকে মনের কষ্ট থেকে বাঁচাতে চাচ্ছেন ?'

'মনের কষ্ট থেকে কে কাকে বাঁচাতে পারে, কর্নেল গাঙ্গুলি ?'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি ওকে জোর ক'রে আটকে রাখছেন।'

'আপনার কথাই ঠিক হয়তো।'

'আপনি এটা ভুলে যাচ্ছেন যে অনেক সময় মনের কষ্ট ভোলবার জন্মেই শরীরের কষ্ট দরকার হয়।'

'এ-কথা মিথ্যে নয়।'

'আপনি ওকে কষ্ট করতে না-দিয়েই ওর প্রতি অন্যায় করছেন। দেখুন, সন্ধ্যা কী-রকম প্রাণ দিয়ে শুশ্রূষা করেছে নিজের চোখে তা না দেখলে এ-কথা বলতুম না।'

'ও পরের মেয়ে, ওকে এতটা করতে দেয়া কি উচিত ?'

'পর ! মিঃ রয়, আপনাকে ভালো লোক ব'লেই জানতুম।'

অবিনাশ ক্ষীণভাবে হাসলো :

'মানুষকে কি এত সহজেই চেনা যায়, কর্নেল গাঙ্গুলি।'

'মাপ করবেন—আপনাকে অনেকদিন ধ'রে দেখছি—আপনার মুখের কথা আপনার মনের সঙ্গে যেন মিলছে না।'

কিন্তু মানুষের 'মনে যে কী থাকে তা কি সে নিজেই সব সময় জানে ?'

'যা-ই হোক, এ নিয়ে আর বেশি ব'লে লাভ নেই। কিন্তু মিসেস রয় যদি সন্ধ্যার কথা বলেন তাহ'লে একবার ভেবে দেখবেন।'

'দেখবো ভেবে।'

'আপনার মনের ভাব যা-ই হোক, আপনার স্ত্রী সন্ধ্যাকে ভালোবাসেন। এত ক'রে বলছি সেইজন্যেই। তাছাড়া এতদিনে একটা অভ্যেসের মতোও হ'য়ে যায়। ও যদি কিছু না-ও করে, তবু ও কাছে থাকলেই ওঁর মনটা হয়তো শান্ত থাকে।'

'আর বলতে হবে না, কর্নেল গাঙ্গুলি: আমি সব বুঝি।'

ডাক্তাররা চ'লে গেলো। রোগীর ঘরে নার্সদের নিঃশব্দ, নিপুণ ব্যস্ততা। চুপচাপ, চুপচাপ। সমস্ত বাড়িটা যেন কম্বলে চাপা। সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই নিঃশব্দতা শুধু জীবন্ত। একজন নার্স বেরিয়ে এসে বললে:

'আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। কিছু ভাববেন না, দরকার হ'লে আপনাকে খবর দেবো।'

ব'লে সে আবার ঘরে ঢুকে দরজাটা হাত দিয়ে টেনে দিলে। অবিনাশ সেই শাদা-রং-করা দরজাটার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। একটু শব্দ আসছে না। সমস্ত পৃথিবী ভ'রে এই শাদা দরজার নির্বাক, নিশ্চল শূন্যতা: আর-কিছু নেই।

তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলে বিকেল হ'য়ে আসছে। আবার বিকেল, আবার রাত্রি! আর কয়েক ঘণ্টা পরেই যে রাত্রি হবে এ-কথা ভাবতে কেমন একটা আতংকে

তার হৃৎপিণ্ড মুচড়িয়ে উঠলো। কী ক'রে সহ্য করবে—এই নির্বাক, নিশ্চল, ভয়ংকর রাত্রিকে কী ক'রে সহ্য করবে সে?

আস্তে-আস্তে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো। খাটের উপর সন্ধ্যামণি শুয়ে আছে। ওর চোখ খোলা, একখানা হাত কপালের উপর। অবিনাশকে দেখে ও তার দিকে পাশ ফিরলো, হাত বাড়িয়ে দিলে খাটের উপর দিয়ে। সে বসলো ওর পাশে, তুলে নিলে ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে।

'এতক্ষণ কী করলে?' ছেলেমানুষের মতো ব'লে উঠলো সন্ধ্যামণি।

অবিনাশ কথা না-ব'লে ওর হাতের উপর চাপ দিলে। ও হঠাৎ একবার ভিতর থেকে কেঁপে উঠলো, কান্না-থেমে-যাওয়া শিশুর মতো। তারপর চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলো।

খানিক পরে অবিনাশ বললোঃ 'আজ আর তোমার যাওয়া হ'লো না।'

সন্ধ্যামণি জবাব দিলো না।

'এখন কেমন লাগছে?'

সন্ধ্যামণির বোজা চোখের দীর্ঘ পক্ষ্মগুলি একবার কেঁপে উঠলো। 'তুমি এখান থেকে যেয়ো না,' অর্ধ-স্ফুট স্বরে সে বললে।

'কাল নিশ্চয়ই তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবো। সঙ্গে কোনো লোক দেবো কি?'

সন্ধ্যামণি আস্তে-আস্তে চোখ মেললো।—'কী হবে এখান থেকে গিয়ে?'

'তুমি কি এখান থেকে যেতে চাও না?'

সন্ধ্যামণি আস্তে মাথা নাড়লো। 'তোমাকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।'

একটু কাটলো চুপচাপ।

'তোমার মা-বাবাকে আসতে লিখে দেবো কি ?'

'কেন ? কী দরকার ?'

'কতদিন তাঁরা তোমায় দেখেন না।'

'বেশ, দাও লিখে।'

আবার একটু চুপচাপ।

'মণি, কিছু খাবে ?'

'কী খাবো ?'

'চায়ের সময় হয়েছে।'

'ক-টা বেজেছে ?'

'চা খাবার জন্য ঘড়ি দেখতে হয় না। নিজের ভিতরেই যথাসময়ে নোটিস পাওয়া যায়।'

সন্ধ্যামণি একটু হাসলো।

'তুমিও একটু খাও ; এখানে নিয়ে আসছি সব।'

'না, না, তুমি যেয়ো না।'

'এক্ষুনি আসছি, মণি।'

আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অবিনাশ উঠে দাঁড়ালো। সন্ধ্যামণি চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

নিঃশব্দে সে নিচে নেমে এলো। নিচেটা একেবারে খালি, চাকর-বাকররা পর্যন্ত ভয়ের শ্বেত শূন্যতায় লুপ্ত হ'য়ে গেছে যেন।

কাউকে সে ডাকলো না, জোরে কথা বলা যায় না আজ। সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়ঃ কোথাও একটু শব্দ হ'লেই চমকে উঠবে কেউ যেন, সমস্ত বাড়ি ভ'রে কোনো তৃষিত, অদৃশ্য আত্মা চীৎকার ক'রে উঠবে।

খাবার ঘরে ঢুকে সে ইলেকট্রিক কেটলিটা লাগিয়ে দিলে। তারপর খুঁজে বের করলে কিছু রুটি আর মাখন, কিছু ফল। এতেই হবে। তারপর সমস্ত চায়ের জিনিশ একটা ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এলো উপরে। প্রথমে সে সেটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর রাখলে, তারপর খাটের শিয়রে ছোটো টেবিল থেকে বইয়ের স্তূপ নামিয়ে রাখলো মেঝের উপর। তারপর সেটা কাছে টেনে এনে ট্রে-টা তার উপর রেখে সন্ধ্যামণির পায়ের দিকে বসলো।

আর যতক্ষণ সে এ-সব কাজ করছে, সন্ধ্যামণি চুপ ক'রে তাকে দেখতে লাগলো।

'উঠে বোসো,' পেয়ালায় চা ঢেলে অবিনাশ বললো।

'না, এখানে এনে দাও।'

গলা-পর্যন্ত-ভরা একটা পেয়ালা অবিনাশ ওর মুখের কাছে রাখলো। বালিশ থেকে একটু মাথা তুলে এক চুমুক চা খেয়েই সন্ধ্যামণি শুয়ে পড়লো আবার।

'চিনি!'

অবিনাশ তার বাটিতে আর-এক চামচে চিনি মিশিয়ে বললে, 'শুয়ে-শুয়ে কেমন ক'রে খাবে?'

'উঠতে ইচ্ছে করে না।'

'কিছু খাবে না?' অবিনাশ রুটি-মাখনের থালাটা দু-জনের মাঝখানে এনে রাখলে।

'রুটিগুলো টোস্ট্ করতে পারলে না?'

'এমনিই বেশ লাগবে—ছাখো খেয়ে।'

সন্ধ্যামণি বালিশের মধ্যে একটা কনুই ডুবিয়ে দিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে অর্ধেক উঠে বসলো। সাগ্রহে খেলো সে, উপভোগ ক'রে, বিছানাময় রুটির গুঁড়ো ছড়িয়ে।

'আর-একটু চা দাও।'

অবিনাশ একটু বেশি ক'রেই খাবার এনেছিলো, কিন্তু কিছুই প'ড়ে রইলো না। দু-জনেরই খিদে পেয়েছিলো।

খাওয়া শেষ ক'রে সন্ধ্যামণি আবার শুয়ে পড়লো। আর অবিনাশ জামার পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে রুটির শাদা-শাদা গুঁড়ো বিছানা থেকে ঝেড়ে ফেললো, নামিয়ে রাখলো জিনিশ-গুলো। তারপর বললো, 'এইবার তুমি ঘুমিয়ে পড়তে পারো।'

'না, ঘুমোবো না।'

অবিনাশ খাটের ধারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে সিগারেট ধরালো।

'কাল রাত্রে তুমি একেবারেই ঘুমোওনি?' সন্ধ্যামণি হঠাৎ জিগেস করলে।

'বাঃ! বেলা আটটা অবধি ঘুমোলাম।'

'তোমার দুপুরবেলার ঘুমটাও তো আমি নষ্ট করলুম।'

'নষ্ট তুমি করলে কোথায়?'

সন্ধ্যামণি একটু চুপ ক'রে থেকে:বললে: 'গরমের ছুটিটা এবার বাইরে কোথাও কাটিয়ে এসো।'

'তোমাকেও নিয়ে যাবো,' বললো অবিনাশ।

সন্ধ্যামণি চুপ ক'রে রইলো।

'যাবে না তুমি ?'

'যাবো।'

'কোথায় যাওয়া যায় তা-ই ভাবছি।'

'যেখানে তোমার খুশি।'

'ডিহিরি গেলে কেমন হয় ?'

'ডিহিরি !' সন্ধ্যামণি মৃদুস্বরে প্রতিধ্বনি করলো।

তারপর অনেকক্ষণ কোনো কথা হ'লো না।

আস্তে-আস্তে সন্ধে হ'লো। অবিনাশ তেমনি ব'সে আছে, খাটের গায়ে হেলান দিয়ে। উল্টোদিকের দেয়াল থেকে রোদের হলদে আভা যখন একেবারে মিলিয়ে গেলো, নিঃশব্দে সে খাট থেকে নামলো।

সন্ধ্যামণি অনেকক্ষণ থেকে চোখ বুজে ছিলো, হঠাৎ চোখ মেলে ব'লে উঠলো, 'কোথায় যাচ্ছো ?'

'আসছি এক্ষুনি।'

'না, যেয়ো না।'

'এই এলাম ব'লে।' সুইচ টিপে সে ঘরের আলো জ্বাললো।

সন্ধ্যামণি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ব'লে উঠলো, 'উঃ !'

'ঢ্যাখো—ঠিক ক'রে দিচ্ছি।' ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজ থেকে একটা

মোমবাতি বের ক'রে জ্বালালো অবিনাশ। ঝকঝকে বার্নিশ-করা টেবিলটার উপর কয়েকটা ফোঁটা ফেলে বাতিটা দাঁড় করালে। আয়নার মধ্যে আর-একটা মোমবাতি জ্ব'লে উঠলো।

'ঠিক হয়েছে?'

'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।'

'এই আসছি,' ব'লে অবিনাশ বেরিয়ে গেলো।

শোভনার ঘরের দরজায় দু-বার মৃদু টোকা দিতেই একজন নার্স বেরিয়ে এলো।

'কেমন আছে?'

'ঘুমুচ্ছেন। ভাবনার কোনো কারণ নেই।'

'এর মধ্যে কি কোনো—কথা বলেছে?'

'না, কথা কিছু বলেননি।'

'কিচ্ছু না?'

'সবসুদ্ধু চারটে কথা হয়তো। না-বলাই তো ভালো।'

অবিনাশ দাঁড়িয়ে রইলো।

'একটু দেখে যাবেন?' ব'লে মোটাসোটা নার্স দরজার এক পাশে স'রে দাঁড়ালো।

'না, থাক। রাত্তিরে যদি কোনোরকম দরকার হয়—'

'দরকার হ'লে আপনাকে নিশ্চয়ই ডাকবো।'

'আর আপনাদের যা-কিছু দরকার, ঐ যশোদাকে বললেই—'

'সে-জন্য আপনি ভাববেন না, মিঃ রয়। অনেক ধন্যবাদ।'

শাদা পোশাক-পরা নার্স শাদা-রঙ-করা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। অবিনাশ ফিরে এসে আবার সন্ধ্যামণির পাশে বসলো। বললে, 'এইবার ঘুমোও।'

সন্ধ্যামণি তার হাতের উপর হাত রেখে বললে, 'তুমি এখানে ব'সে থাকো, এখান থেকে চ'লে যেতে পারবে না।'

'না, চ'লে যাবো না। তুমি ঘুমোও।'

সন্ধ্যামণি নিশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজলো।

ঘরের মধ্যে মোমবাতির অস্পষ্ট আলো, সমস্ত বাড়ি চুপচাপ, দু-জনে চুপচাপ। তারপর, মোমবাতিটা যখন আধখানা হ'য়ে গেলো, আর দীর্ঘ নিয়মিত ছন্দে সন্ধ্যামণির নিশ্বাস পড়ছে, অবিনাশ আস্তে-আস্তে উঠলো। সন্ধ্যামণির সেই ছোটো ঘর থেকে পাটি আর বালিশ নিয়ে এসে মেঝেতে পাতলো। হাতের এক নাড়ায় মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়লো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে।

তারপর আরো একটা দিন। অবিনাশের চেতনার উপর ভারি একটা কুয়াশা নেমে এসেছে যেন। ভালো ক'রে সে কিছু বুঝতে পারছে না, টের পাচ্ছে না। সকাল থেকে বাড়িতে কারা যেন সব। ডাক্তার। আত্মীয়। এমন কি প্রতিবেশী ব্যারিস্টর স্বরেন বর্মনকেও যেন একবার লক্ষ্য করলো। কেমন ক'রে জানলো এরা? কে এদের খবর দিলে?

মাঝে-মাঝে তার খেয়াল হয় দোতলার সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে। ফিশফিশ ক'রে, চুপি-চুপি স্বরে। কী

বলছে নিজেই বুঝতে পারে না। জোরে কথা বোলো না আজ, জোরে পা ফেলো না। ওকে ঘুমোতে দাও, ওকে ঘুমোতে দাও। ও বড়ো ক্লান্ত : দীর্ঘ যুদ্ধের পরে আজ এতদিনে নিবিড় হ'য়ে নামলো শান্তি, আজ তোমরা গোল কোরো না।

আজ আর তার কিছু করবার নেই, বাড়ি-ভরা লোক। আজ তার ছুটি। আজ থেকে সমস্ত জীবন তার ছুটি। সবাই তার দিকে কেমন-এক বিশেষ ধরনে তাকায়। মৃত্যুর মহিমা তার মুখে প্রতিফলিত। এত আয়োজন, এত সমারোহ খানিকটা যেন তারও জন্যে। সন্ধ্যামণির শিয়রে চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে তার মনে হয়, এতদিন যা-কিছু তাকে জড়িয়ে রেখেছিলো সব ছিঁড়ে গেছে ; আজ সে মুক্ত ; আজ সে অতীতহীন, স্মৃতিহীন, সদ্যোজাত।

'মণি।'

সন্ধ্যামণি কথা না-ব'লে চোখ তুলে তাকালো।

'তোমার কি খারাপ লাগছে খুব ?'

'না।'

অবিনাশ ওর কপালের উপর হাত রাখলো। বোধহয় একটু জ্বর হয়েছে।

'হাওয়া করবো মাথায় ?'

'করো।'

অবিনাশ কোত্থেকে একটা হাত-পাখা নিয়ে এসে আস্তে হাওয়া করতে লাগলো। নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজলো সন্ধ্যামণি।

খানিক পরে তার পিসতুতো বোন কমলা এসে বললে, 'এইবেলা তুমি কিছু খেয়ে নাও বরং।'

অবিনাশ জবাব দিলো না।

কমলা আবার বললে, 'এখানে এনে দেবো ?'

'না, নিচেই যাচ্ছি।'

'সন্ধ্যা খাবে না ?'

'ওর শরীর ভালো নেই।'

'শরীর আর কী ক'রে ভালো থাকে। তবু—কিছু খেতে তো হবে।'

'ওকে যা-হোক কিছু এনে দাও।'

'আচ্ছা। তুমি একটু মুখে দিয়ে এসো তো।'

বাইরে এসে কমলা বললে, 'অবি-দা, সন্ধ্যাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে হ'তো।'

অবিনাশ অবাক হ'য়ে বললে, 'কেন বলো তো ?'

কমলা এই প্রশ্নে অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো।—'ওকে কেন মিছিমিছি—' সে বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'সেই যে সকাল থেকে শুয়েছে—'

'ওর শরীর ভালো নেই,' নির্বোধের মতো জবাব দিলো অবিনাশ।

কমলা মনে-মনে বললে, 'ভুল হয়েছে আমার ও-কথা বলতে যাওয়া। আর-একজনের মনে কী-রকম লাগবে তা বোঝবার মতো মনের অবস্থা কি এখন ওঁর !'

সন্ধের সময় কর্নেল গাঙ্গুলির সঙ্গে নিভৃত আলাপ।

'Mr. Roy, you must prepare yourself for the worst.'

'আমি তো অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে আছি।'

'মানুষের যতটা সাধ্য সব করা হয়েছে। এখন ঈশ্বরের হাত।'

'ঈশ্বরের হাতেও কিছু কি আছে এখন ?'

'মাঝে-মাঝে মির‍্যাকল ঘটে বইকি।'

'আপনি আর কেন মিছিমিছি কষ্ট করছেন—' অবিনাশ আরম্ভ করলো।

'না, কষ্ট আর কী, এই তো আমাদের কাজ। আমাকে শেষ পর্যন্ত দেখে যেতেই হবে।'

অবিনাশ চুপ ক'রে রইলো।

'যদি আজকের রাতটা কেটে যায়—আজকের রাতটা কেটে যায়—কখনো-কখনো এ-রকমও হয়, মিঃ রয়।'

'হয়, শুনেছি।'

কর্নেল গাঙ্গুলির নীল, স্নিগ্ধ চোখ অবিনাশকে ভালো ক'রে একটু দেখে নিলে।

'অবশ্যি মনে কোনো আশা না-রাখাই ভালো। স্পষ্ট ক'রে বললুম, এখন আর মনকে ভোলাবার সময় নেই।'

'আমি তো মনে কোনো আশা রাখিনি।'

কর্নেল গাঙ্গুলি একটু চুপ ক'রে রইলেন।

'আমি দুঃখিত—এত ক'রেও কিছু করতে পারলুম না।'

'অদৃষ্টের উপর হাত আছে কার ?'

'দেখুন, আমরা ডাক্তাররা চোখের সামনে থাকি, আমাদেরই যত শাপ কুড়োতে হয়।'

'ও-সব কেন বলছেন ? আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

কর্নেল গাঙ্গুলির সঙ্গে সে গেলো রোগীর ঘরে। ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত তীব্র গন্ধ। সারাদিন ধ'রে ওরা কী-সব করেছে শাদা পোশাকের ভিতর থেকে নার্সদের রক্তিম, গম্ভীর মুখ। কর্নেল গাঙ্গুলির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাক্তারটি একটা চেয়ারে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ব'সে। বেঁটে-মতো ভদ্রলোক, ফোলা-ফোলা গাল। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসেছেন, আঙুলগুলো হাঁটুতে জড়ানো। ছবি তোলাচ্ছেন যেন। নখগুলো ঝকঝকে পালিশ-করা। হাতের যত্ন এরা নেয় বটে, এই ডাক্তাররা।

সেই ম্লান-নীলাভ ঘরে অবিনাশ বিছানার দিকে এগিয়ে এলো। শাদা একটা চাদরে শোভনার গলা পর্যন্ত ঢাকা। নিশ্বাস পড়ছে থেমে-থেমে : দীর্ঘ, ভারি নিশ্বাস, চাদরের নিচে তার সমস্ত বুক ফুলে-ফুলে উঠছে। খুব কি লাগে—ঐ রকম ক'রে নিশ্বাস নিতে ? কিন্তু তার মুখে কোনোরকম কষ্টের চিহ্ন নেই। চোখ তার বোজা। এতদিনে—এতদিনে সে চোখ বুজতে পারলো। এতদিনে সে অন্ধ হ'য়ে যেতে পারলো—প্রতি মুহূর্তে প্রাণপণে তাকিয়ে থাকার নিষ্ঠুর প্রয়োজন থেকে মুক্তি পেলো। আর তাকে তাকিয়ে থাকতে হবে না—আর তাকে দেখতে হবে না, কথা বলতে হবে না, বুঝতে হবে না, ভাবতে হবে না।

অনেকক্ষণ সে বোধহয় খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ বাহুর উপর কর্নেল গাঙ্গুলির হাত।

'আপনি কি এ-ঘরে থাকতে চান ?'

'দরকার আছে কোনো ?'

'না, আপনি বরং—' কর্নেল গাঙ্গুলি দরজার দিকে বাহুর একটা ভঙ্গি করলেন, 'আমাদের শেষ যা চেষ্টা করবার করতে দিন।'

অবিনাশ খাটের ধার থেকে স'রে এলো।

'যদি আপনি থাকতে চান—' কর্নেল গাঙ্গুলি খুব মৃদুস্বরে বললেন।

'না, আমি থেকে আর কী করবো ?'

অন্ধকার ঘর, সন্ধ্যামণি যেখানে শুয়ে আছে একটু শব্দ আসছে না। ইলেকট্রিক আলো না-জ্বেলে অবিনাশ হাৎড়ে-হাৎড়ে মোমবাতি বার ক'রে জ্বালালে। ঘরের জিনিশগুলোর কঙ্কাল-ছায়া পড়লো দেয়ালে। বাতির শিখাটা কেঁপে উঠলো, শাদা দেয়ালের উপর দিয়ে ফ্যাকাশে ছায়াগুলো পরস্পরকে তাড়া করছে।

অস্পষ্ট তন্দ্রার মধ্যে সন্ধ্যামণি অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠলো।

তারপর অবিনাশ ওর পাশে গিয়ে বসতেই দুই দীর্ঘ, উৎসুক বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে, বালিশ থেকে মাথা সরিয়ে এনে তার কোলের উপর মুখ চেপে ধরলো।

অবিনাশ ওর কপালের উপর নিঃশব্দে চুম্বন ক'রে বললে: 'ভয় কী।'

সমস্ত রাত সন্ধ্যামণি জ্বরে ছটফট করলো, আর সমস্ত রাত দেয়ালের উপর প্রেত-ছায়াগুলোর অদ্ভুত নৃত্য, আর অবিনাশ রইলো জেগে, আর সমস্ত বাড়ি চুপচাপ, চুপচাপ—সমস্ত রাত ভ'রে চাপা দিয়ে রেখেছে তার রহস্য।

তারপর, রাত যখন প্রায় ভোর, হঠাৎ কমলা সেই ঘরে এসে ঢুকলো।

'অবি-দা, একবার চলো,' রুদ্ধস্বরে সে বললে।

৫

ঘন গ্রীষ্ম: আকাশে গ্রীষ্মের কুয়াশা। ধূসর ঢেউ-খেলানো প্রান্তর দিগন্তে ধোঁয়ার মতো মিশে গেছে। দিগন্তের পাহাড়ের মতো নির্নিমেষ নিস্পন্দ উত্তাপ। পাখি ডাকে না, পাখি উড়ে যায় না তীরের মতো বাতাসকে চিরে। কোনো শব্দ নেই। শুধু হাওয়া: শুধু মাঝে-মাঝে গরম গ্রীষ্ম-হাওয়ার ঢেউ। মাইলের পর মাইল একটা কুকুর চোখে পড়ে না। মাঝে-মাঝে ঝাপসা গাছ; পায়ের কাছে ছাড়া কাপড়ের মতো একটুখানি ছায়া। চোখ ফিরে আসে, চোখ বুজে আসতে চায়। তবু, জানলা বন্ধ-করা ঘরে অবিনাশের ভালো লাগে না। তার দেখতে ইচ্ছে করে; পশ্চিমের এই ভরা গ্রীষ্মের কি একটা রূপ নেই? যেমন বাংলার বর্ষা কূলে-কূলে ভ'রে ওঠে। তার বারান্দার পরেই ধোঁয়াটে দিগন্তরেখা, মাঝখানে অনেক মাইল ধোঁয়াটে প্রান্তর; ধোঁয়াটে, শাদাটে আকাশ পুরোনো পাহাড়ের বুকে ম'রে প'ড়ে আছে। এই গরমেই স্বাস্থ্য, ডাক্তার বলেছিলো। সে ভাবেনি আবার সে ডিহিরিতে আসবে, কিন্তু ডাক্তার বলেছিলো। এই গরমেই স্বাস্থ্য। তার নিজেরও শরীর ভালো হ'য়ে উঠছে। দরকার ছিলো—এই বিশ্রামের, এই গ্রীষ্ম-মূর্ছার দরকার ছিলো। ক্লান্ত, কত ক্লান্ত সে নিজেও বুঝতে পারেনি। এই গরমে চামড়া

পুড়ে যায়, কিন্তু রক্তে আসে ধার। সত্যি, এই ক'-দিনেই তার অনেক ভালো লাগছে। এই গরমে বম্বাই থেকে বাংলা পর্যন্ত আম পেকে উঠছে। মোটা-মোটা ল্যাংরা, বাইরে সবুজ, ভিতরে লাল, রসালো মাংস। ভবানীপুরের সব বাড়িতে সেই আমের সৌরভ। শিশুদের ভরা মুখ থেকে রস উপচে পড়ছে। অস্পষ্ট স্বরে আরো চাইছে তারা, বাড়িয়ে দিচ্ছে দাগ-লাগা আঙুল। একটা সুন্দর নীল মাছি খোশার উপর স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে।

হয়তো কলকাতায় এতদিনে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। কাগজে কী লেখে? কিন্তু এখানে এসে অবধি সে খবর-কাগজ দ্যাখেনি। বৃষ্টি, আর সেই মেঘ-ছেঁড়া চনচনে রোদ। সেই মেঘ, বিকেলে কালো-হ'য়ে-আসা আকাশ। ফুটবলের মাঠে ভিড়। লোকের মুখে আর-কোনো কথা নেই। ময়দানের পশ্চিমে মেঘে-মেঘে রং। ভেজা রাস্তায় মোটরগুলোর পিছনে লাল আলোর দীর্ঘ কম্পিত ছায়া। ধুলো-ধুয়ে-যাওয়া শহর রাত্রির আলোয় ঝলোমলো। হয়তো কলকাতায় এখন বৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু কলকাতা ছাড়তে এবার তার ভালোই লেগেছিলো। ফেলে এসো, ও-সব ফেলে এসো পিছনে। রেলগাড়ি ছুটে চলুক রাত্রিকে দু-টুকরো ক'রে। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে সে তাকিয়ে ছিলো সমস্ত রাত। ভরা গ্রীষ্মের রুপোলি জ্যোছনার মাঠ আর বন আর মাঝে-মাঝে পাহাড়। গাড়ির সঙ্গে চাঁদের দৌড়ের পাল্লা। ছিরে-ছিটোনো জল চাঁদের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে। অবাক হ'য়ে সে তাকিয়ে ছিলো, ছেলেবেলায় সে ম'রে গেলেও

রেলগাড়ির জানলা থেকে মুখ ফেরাতে পারতো না। কত কী দেখবার। ঐ একটা গোরু। একটা পুকুর। টেলিগ্রাফের থামে মাইলের নম্বর। লাইনটা কেমন বেঁকে গেছে। গলা বাড়িয়ে ছাখো, এঞ্জিন! ধোঁয়ার মস্ত নিশেন আকাশে উড়ছে। কতবার কয়লার গুঁড়ো গেছে চোখে। একবার কী ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলো। ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো মনে আছে। আর বাবা কোঁচার খুঁটে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে গরম ক'রে চোখের উপর চেপে ধরছেন। ধোঁয়া সম্বন্ধে সে ভারি অদ্ভুত ভাবতো। ভাবতো, এই এঞ্জিনের ধোঁয়াই আকাশে জ'মে-জ'মে মেঘ হয়, সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি। যখন পৃথিবীতে রেলগাড়ি ছিলো না, তখন কেমন ক'রে বৃষ্টি হ'তো— সে অবাক হ'য়ে ভাবতো।

কিন্তু সেই রুপোলি রাত্রির ভিতর দিয়ে রেলগাড়িতে ছুটে যাওয়া ভারি অদ্ভুত। দূরে, কত দূরে, আরো কত দূরে। সমস্ত পৃথিবী থেকে দূরে। কলকাতায় ব'সে কে ভাবতে পারে এখানে এই নদী—আর মাঠ, আর বন! কলকাতায় ফিরে গিয়ে হঠাৎ যদি কখনো মনে হয় সেই যে পাহাড় দেখেছিলুম সেটা এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে—কী অদ্ভুত। রাত্রির ভিতর দিয়ে ছুটে যাওয়া— ফেলে এসো, ও-সব ফেলে এসো পিছনে। এত ক্লান্ত তার লাগছিলো, তবু সে ঘুমোতে পারেনি। দেখবে, কী-যেন দেখবে, এই ঝাঁ-ঝাঁ জ্যোছনায় কী-না দেখে ফেলতে পারে! একবার ছেলেবেলায় হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেছিলো তাদের উঠোনে পরিরা খেলা করছে জ্যোছনায়। স্পষ্ট দেখেছিলো। এখনো

মনে করতে পারে। একটু পরেই তারা কোথায় গেলো মিলিয়ে, কিন্তু সে সন্দেহ করেনি। পরিরা হয়তো এমন ক'রেই দেখা দেয়।

আর ভোরের একটু আগে শোন নদীর হলদে বালু চাঁদের আলোয় চিকচিক। হঠাৎ মরুভূমি মনে হয়। মাঝখান দিয়ে তিরতির ক'রে চলেছে সরু একটু জলের রেখা। ভরা চাঁদ পশ্চিমে হেলানো। পুলের উপর দিয়ে আস্তে-আস্তে চলেছে গাড়ি, চাপা, একটানা শব্দ ক'রে। চারদিকে অপরূপ স্তব্ধতা, শোভাকে ডেকে তুলবে কিনা, সে একবার ভেবেছিলো। থাক, ও ঘুমুচ্ছে, ওর ঘুমোনোই দরকার। ও ঘুমিয়ে পড়েছিলো হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। সে তাকিয়ে দেখেছিলো ওর দিকে, কাৎ হ'য়ে শুয়ে আছে, পায়ের উপর থেকে সুজনিটা স'রে কামরার মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। সে সেটা তুলে শোভাকে হাঁটু অবধি ঢেকে দিয়েছিলো। একবার ওর ঘুম ভাঙেনি এর মধ্যে: ভালো। এত দুর্বল ওর শরীর, বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটে। ওকে শুধু ভালো হ'য়ে উঠতে হবে, আর-কিছু ওর করবার নেই। এখানকার গরমে স্বাস্থ্য। এই গরম হাওয়ায় স্বাস্থ্যের শক্তি। কিন্তু শোভা ঘুমিয়ে আছে অন্ধকার ঘরে, সমস্ত দুপুর। দরজায় পুরু খসখস, চাকর মাঝে-মাঝে সেটা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিকেলে উঠে বসবে, একটু চলাফেরাও করবে হয়তো। এখনো পা কাঁপে, তবু চেষ্টা করে হাঁটতে। শুয়ে-শুয়ে আর তার ভালো লাগে না? সত্যি, কত আর শুয়ে থাকা যায়। আর, একদিনের জন্য মাথা ধরেনি, এমন স্বাস্থ্য ছিলো তার। দিনে ঘুমোয়নি কখনো। Wonder-

ful vitality; জীবনের উপর আশ্চর্য দখল। সেরে উঠতে সে দেরি করবে না। প্রতি মুহূর্তে সে ভালো হ'য়ে উঠছে; বাতাস থেকে শোষণ ক'রে নিচ্ছে স্বাস্থ্য। এরই মধ্যে তার মুখ একটু ভ'রে উঠেছে। আশ্চর্য, আশ্চর্য দখল জীবনের উপর। কাজ ক'রে যার কখনো তৃপ্তি ছিলো না, কত আর তার সহ্য হয় অন্যের উপর এই নির্ভর, এই নিশ্ছিদ্র বিশ্রাম! সে যদি আবার তার নিজের জীবনকে নিতে না-পারে—

বলেছিলো: বেড়াবে? আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে চলো না।

না।

এমনি চলতে যদি কষ্ট হয়—

এমনিই পারবো।

রোজ একটু-একটু হাঁটে, কালকের চাইতে আজ একটু বেশি। নরম তার চোখ, চোখের পাতা হঠাৎ কেঁপে-কেঁপে ওঠে। দূরে তার আশার ছায়া পড়েছে, সেইদিকে তাকিয়ে তার চোখ আজ নরম।

খুব বেশিদিন থাকতে হবে না এখানে।

ডাক্তার যে ব'লে দিয়েছে—

এখানেই প'ড়ে থাকবো নাকি তাই ব'লে?

আচ্ছা, আগে সেরে তো ওঠো।

সেরে তো উঠেছি। আর ভালো লাগে না। তুমি কি এখানে আরো থাকতে চাও?

কিছুদিন তো থাকতেই হবে।

আমার জন্যেই তো? কিন্তু আমি খুব শিগগিরই একেবারে সেরে উঠবো, দেখো। আর কষ্ট দেবো না তোমাকে।

আমার তো এখানে ভালোই লাগছে।

ডাক্তারদের সব কথা! কেবল খরচ, খরচ ছাড়া কথা নেই। দু'মাস গিয়ে চেঞ্জে থাকো—বললেই হ'লো। আমার জন্যে তুমি চাকরি ছাড়বে নাকি?

ছুটি নেবো।

না, না, ছুটি তোমাকে নিতে হবে না, তার আগেই ফিরতে পারবো।

কলকাতায় গিয়েই বা কী হবে?

কী হবে! সবই তো প'ড়ে আছে সেখানে। বাড়ি-ঘর ছেড়ে কতদিন আর থাকা যায়।

ফিরবোই তো।

তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, ডাক্তারদের খেয়াল মেটাতে তুমি খামকা ব'সে-ব'সে আর টাকা নষ্ট করতে পারবে না।

তখন তো বলেছিলুম বাড়িটা ছেড়ে দিয়েই আসি—

পাগল! অত সব জিনিশপত্র কী হ'তো? আর তাও চাকর-বাকরদের হাতে কী ছিরি হয় ছাখো।

কী আর হবে।

পরের জিনিশের উপর কি আর তেমন মায়া হয় কারো। হরেনবাবুকে বলেছিলে তো মাঝে-মাঝে একটু দেখাশোনা করতে?

বলেছিলাম।

ভালো লাগে না আর মাসের পর মাস এই বাড়ি-ভাড়া গোনা। কতগুলো টাকা নষ্ট ভাবতে পারো?

হ্যাঁ, এবার একটা বাড়ি করলেই তো হয়।—কথাটা ব'লে হঠাৎ হেসে ফেললো অবিনাশ—কেমন তেতো হাসি।

এমন কপাল, আমার জন্যেই এবার হ'লো না।

হবে, হবে।

হবে। শোভার বাড়ি হবে। সুন্দর পালিশ-করা মেঝে আর সুন্দর রং-করা দেয়াল আর সামনে ফুলের বাগান আর প্রতিবেশীরা বেড়াতে এলে কনক দাসের নতুন রেকর্ড। তার জিনিশপত্র রাখবার জন্যে নিশ্চিন্ত, স্থায়ী একটা জায়গা। নিশ্চিন্ত, বাকি জন্মের মতো নিশ্চিন্ত। বাকি জন্মের মতো যথেষ্ট করবার, যথেষ্ট ভাববার। তার নিঃসংশয় রাজত্ব। সমস্ত বাড়িতে আর রাশীকৃত জিনিশে তার আত্মা জড়ানো। বছরের পর বছর নিজের চারদিকে তার ইচ্ছার জালবোনা। আর-কিছু সে চায় না, মেয়েদের জীবনে আর কী থাকতে পারে চাইবার? কোথাও সে যেতে চায় না, তার সব জিনিশপত্র দেখবে কে? বাড়ি থেকে সে বেরোতে চায় না—কোথায় যাবে? নিজের ব্যবহারের, নিজের আরামের জন্য কিছু চায় না সে: সুখের কি অভাব যে আরো কুড়োতে হবে? কেউ যেন মনে না করে জীবনকে বড়ো সহজে সে পেয়েছিলো। এই এতদিন যে-কষ্ট সে পেলো—কিন্তু এইবার নতুন ক'রে আরম্ভ করবে।

আর আমার আর-কিছু করবার থাকবে না, আর-কোনো স্বপ্নে ভেঙে যাবে না আমার ঘুম, আর কোনো দুঃস্বপ্নে রাত্রি ভ'রে উঠবে না। আর পাঁচ বছর পরে বয়স হবে চল্লিশ, শাদা হ'তে আরম্ভ করবে চুল, অকালেই আমি বুড়িয়ে যাবো। আর তারপর ভিতর থেকে ঠেলে বেরোবে রোগ, আশ্চর্য প্রচণ্ড কোনো রোগ নয়, অসংখ্য ছোটোখাটো ছিঁচকে লেগে-থাকা অসুখ, যা আস্তে-আস্তে মারে। রোজ একটু-একটু ক'রে মারবে। আর জীবন চলবে ডাক্তারের রুটিনের তালে, এক গ্লাশ জল খাওয়ার জন্য ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা। একদিন যে এ-রকম হবে তা তো অনেক আগে থেকেই সে ধ'রে রেখেছে। চল্লিশ পর্যন্ত ঠিক ক'রে রেখেছিলো মেয়াদ। সেই সময়ের এত কাছে এসে পড়েছে! এখন আর খেয়াল না-করবার সময় নেই। ছেলেবেলায় খেলাধুলোয় মন ছিলো না। বাবা বকতেন। এতদিন তার হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কোনোকালেই ঠিক পুরুষের উপযুক্ত ছিলো না তার শরীর। ষোলো থেকে কুড়ির মধ্যে যে-বয়েসটায় ছেলেরা ঝড়ের মতো ছুটে চলে, তখনো···শালিরা ঠাট্টা ক'রে নানারকম বলতো। কিন্তু তাঁর খুলির ভিতরকার জিনিশটা খুব উঁচুদরের, তা নিয়ে গর্ব ছিলো তার মনে। পৃথিবীতে এত মস্তিষ্কহীন অ্যাপোলোর দেখা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য নিয়ে বড়ো বেশি হৈ-চৈ করি আমরা আজকাল। রোগা জাত ব'লে। দেশে একরকম ছেলে তৈরি হচ্ছে, চৌকশ ছেলে। তারা হকি খেলে, তারা বক্তৃতা দেয়, তারা ইংরিজি দৈনিকে প্রবন্ধ লেখে, তারা পরীক্ষায় ফার্স্ট

হয়। আত্ম-সচেতন চৌকশত্ব: পাঁচ মিনিটের আলাপে তারা যতগুলো সম্ভব 'খেলা' দেখাবে। একজন যদি সমস্ত বিষয়েই কথা বলতে পারে, যদি কোনো বিষয়েই চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য না হয়, কী ভয়ানক অন্যের পক্ষে, কিন্তু তার নিজের পক্ষে সব চেয়ে বেশি—কী ভয়ানক! দেশে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা খোলা হবার একটা ফল। স্কুলের কোন 'ভালো' ছেলে জীবনে একবার অন্তত আশা না করে! আর তাই তারা শরীরের চর্চা আরম্ভ করে, আর পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে খবর না-রাখলে চলে না। তাই তো দেখা যায় এ-সব ছেলে, চমৎকার স্বাস্থ্য, পৃথিবীর সাঁতারের রেকর্ড আর আমেরিকার ট্যারিফ-নীতি দু-বিষয়েই সমান উৎসাহ নিয়ে অনর্গল কথা বলতে পারে—কিন্তু যে-জীবন তারা বাঁচছে তা যেন কোনোখানেই তাদের ঘা দেয় না, ভিতর থেকে কোনোরকম সাড়া দেবার ক্ষমতাই যেন তাদের নেই।

কিন্তু তবু—জীবনের শেষ বছরগুলো ভ'রে নিরবচ্ছিন্ন রোগ। একটু কিছু খাও: ঢেঁকুর তোলো। ঢিলে, পাঁশুটে চামড়া। নিষ্প্রভ, হলদে চোখ। শুধু কষ্ট নয়, এর কুশ্রীতা। টাক পড়বে কি? তাদের বংশে কারো টাক নেই, এখনো একটু পাৎলা হয়নি তার ঘন, শক্ত চুল। কখনো তার টাক পড়বে না এ-কথা ভাবতে ভালো লাগে। এখনো কি কিছু করা যায়, এই পাঁচ বছরে কিছু কি করবার আছে? কী-সব নতুন রকমের ব্যায়াম নাকি বেরিয়েছে, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আড়াই মিনিটে করা যায়। তলপেটের ব্যায়াম। এক ভদ্রলোক কোন সন্ন্যেসির কাছে

যোগের কয়েকটা প্রক্রিয়া শিখেছিলেন : চমৎকার ফল পেয়েছেন নাকি। ফিরে গিয়ে কর্নেল গাঙ্গুলিকে জিগেস করবে। একদিন তাঁরই হাতে ছেড়ে দিতে হবে নিজেকে। তিনি তাকে পাঠাবেন ভুবনেশ্বরে জল খেতে, বিন্ধ্যাচলে হাওয়া খেতে···হয়তো আবার এই ডিহিরিতেই। কর্নেল গাঙ্গুলি, অন্য কোথাও গেলে হয় না? এমন কোনো জায়গা কি নেই, ডিহিরির চেয়েও যা ভালো? না, না, ডিহিরিতেই যান, জায়গাটা বেশ ফাঁকা, আর সেখানে এই গরমের সময়টাই সবচেয়ে ভালো। আর গাছের ফাঁকে-ফাঁকে সেই মাছরাঙা-শাড়ি আর হাসির শব্দ, আর সেই যে ছোকরা যে বলতো আজ আমাকে একটা পয়সা দেবেন, কাল দু-পয়সা; পরশু—সত্যি, একমাসে ঠিক কত দাঁড়ায়? একদিন অঙ্ক ক'সে দেখলে হয়।

না, ডিহিরিতেই যান। বড়ো ভালো লোক কর্নেল গাঙ্গুলি, শাদা চুলের নিচে এমন প্রশান্ত তাঁর মুখ। কী খুশি তিনি হয়েছিলেন মৃত্যুর উপরে এই জয়ে। কিন্তু কোনো গর্বের স্বর ছিলো না তাঁর কথায়। ঈশ্বর আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, মিঃ রয়। তাঁর মনের কথা সেটা। সমস্ত রাত তিনি কী করেছিলেন? চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন বোধহয়—বাড়ির লোক খুশি হবে ভেবে। সে যখন গেলো তখন তো তা-ই দেখলো। কী কষ্টে, কী ভয়ানক কষ্টে নিশ্বাস পড়ছে। কমলা, তুই এখান থেকে যা। এই একটা কথা সে বলেছিলো, মনে আছে। আরো কত লোক ঘরে। আর কর্নেল গাঙ্গুলি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। আর তারপর ঘরের মধ্যে রোদ, আর কর্নেল গাঙ্গুলি পেটে একটা ইনজেকশন

দিচ্ছেন, আর কমলা একটা চেয়ারে ব'সে দু-হাতে মুখ ঢেকে আছে। আস্তে শোভা চোখ খুলেছিলো, আস্তে। আর তারই মুখের উপর পড়েছিলো তার ভীষণ, তৃষিত চোখ। অপরিসীম, অপরিমেয় তৃষ্ণা: সমস্ত আক্ষেপের, সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে বেশী—তৃষ্ণার সেই প্রচণ্ড স্তব্ধতা। সে বুঝেছিলো, সে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলো।

—যা আমাদের কষ্ট দেয় তা এই জীবন নয়, জীবনকে যে আমরা বিশেষ একরকম ক'রে পেতে চাই, সেই বাসনা। যা-কিছু আমরা পাই, শুধু তা-ই নিয়েই খুশি হ'তে পারি না আমরা, তাকে আমরা তৈরী করতে চাই বিশেষ একটা রূপে। চাই সৃষ্টি করতে। অন্য সমস্ত জিনিশ সুখ দিতে পারে, কিন্তু যতদিন নিজের সেই জীবনকে সৃষ্টি করতে না পারি, গভীরতম তৃপ্তি কিছুতেই পাবো না, ততদিন জানবো না পরিপূর্ণতা। কিন্তু আমি তো তা চাইনি, অনেক, অনেকদিন পর্যন্ত তা চাইতেই আমি ভুলে ছিলুম। মেনে নিয়েছিলুম, জীবনকে নিয়েছিলুম অন্যের হাত থেকে। খানিকটা ঠাণ্ডা স্বভাবের জের, ভালোমানুষির বিড়ম্বনা। এমন ঠাণ্ডা ছেলে কখনো দেখা যায় না। মা-মরা ছেলে যে এমন হয়, সবাই অবাক হ'তো আমার ছেলেবেলায়। বাবাকে ঈশ্বরের মতো মানতুম। অমন ভালো বাপ কার হয়? ভালো ছাত্র ছিলুম: বিদ্বান হবো, এর চেয়ে বড়ো আশা কিছু ছিলো না। বাবাকে দেখতুম চোখের সামনে, কী অনায়াসে সমস্ত জীবনকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেরোসিনের আলোয় ব'সে বের্গসঁর ক্রিয়েটিভ এভোল্যুশন পড়া।

আমার কৌতূহল ছিলো দুঃসাহসী, একদিন সেই বই খুলে পড়তে বসেছিলুম। মাঝে-মাঝে ঘাঁটাঘাঁটি করতুম তাঁর মোটা-মোটা বইগুলো নিয়ে—কষ্ট হ'তো, বুঝতে পারতুম না। যেন আলাদিনের আশ্চর্য গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, মন্ত্র জানিনে, গুহার দরজা খুলবে না। আমাকে শেখাও সে-মন্ত্র, সে-মন্ত্র আমাকে শেখাও। এই আমার প্রতিদিনের প্রার্থনা। কবে বুঝতে পারবো এ-সব বই। আমার স্তূপীকৃত সব গল্পের বই এক-এক সময় বিষ হ'য়ে উঠতো। ঐ সব কালো মলাটের মোটা বইয়ে কী আছে তা যদি না-জানলুম···তার তুলনায় বুঝি জুল ভের্ন্-এর রোমাঞ্চও যথেষ্ট রোমাঞ্চকর নয়। আর তাই কলেজ-হস্টেলের সেই ছোটো ঘরে আনন্দের কত অপরূপ মুহূর্ত আমি কাটিয়েছি। তার তুলনা হয় না, জানবার সেই নেশা, গুহার একটু-ফাঁক-হ'য়ে-যাওয়া দরজার ভিতর দিয়ে রাশি-রাশি ঐশ্বর্যের সেই প্রথম আভাস। যখন বুঝতে পারলুম এর শেষ নেই, কোনোকালে এ শেষ হবার নয়—কী হতাশা তখন, আর কী উন্মাদনা! ধন্যবাদ জানালুম সমস্ত মানব-জাতিকে, সেই পবিত্র মন্ত্রে অধিকার পেয়েছি ব'লে। আর আমাকে ক্ষুধিত থাকতে হবে না, আর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না দরজার বাইরে: মানুষের চিরকালের সোনার ফসল আজ আমার জন্য, আমার তৃপ্তির জন্য। আর আমার মনে হয়েছিলো কেউ যেন আমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলে, রাজা করলে আমাকে। আর আমার কোনো ভাবনা নেই, আমি পেয়ে গেছি। কী সর্বনাশ, যদি

আমাকে নিরক্ষর থাকতে হ'তো। ভাবতে শিউরে উঠতুম আতংকে। তা কি হ'তে পারতো, আমাকে কি ওরা না-খেয়ে মরতে দিতো? আর কী ভালো আমার লাগতো, হস্টেলের সেই ঘরে ব'সে অন্তহীন ফসল থেকে বেছে-বেছে সোনালি ধান কুড়োনো। প্রথম প্রেমের উন্মাদনা: সন্ত উপনায়ন, এতদিন যার নাম শুনে আসছি কিন্তু দেখিনি তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

আমি ভেবেছিলুম এই যথেষ্ট, এ ছাড়া কিছুর প্রয়োজন নেই। বাবাকে দেখেছিলুম, দেখেছিলুম তাঁর আত্ম-সমাহিত স্থৈর্য। এ তো আরম্ভ মাত্র, দীর্ঘ রোমাঞ্চময় যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। সমস্ত আকাশ উদ্দীপনায় জ্ব'লে উঠেছিলো, দেবতার মতো সব মানুষের মহিমার জ্যোতিঃস্রোত। সেই আলোয় অন্য-কিছু আমি দেখতে পাইনি। আমার ছিলো না আজকালকার ঝকঝকে চৌকশত্ব: শহুরে ছেলের সেই প্রবৃত্তি যাতে সে নিজেকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়—কিছু সে ছেড়ে দেবে না, কোনোদিক থেকে বঞ্চিত হবে না সে। আড়চোখে ওরা আমার দিকে তাকাতো, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা করতো আমাকে নিয়ে। আমার মধ্যে নাকি মফস্বলের ছেলের সবগুলো লক্ষণ পুরোমাত্রায়। ওরা চেষ্টা করতো আমাকে বাইরে টেনে আনতে, আমার মফস্বলিয়ানাটা কোনোরকমে একবার ঝেড়ে ফেলতে পারলে আমি চলনসই গোছের মানুষ হ'য়ে উঠতে পারি, এ-রকম একটা মতের প্রচলন ছিলো। কিন্তু ওদের ঠাট্টা কি গায়ে লাগতো আমার? বিকেলে ওরা যখন প্রসাধনের গন্ধ ছড়িয়ে দল বেঁধে বেরুতো, আমি কি একটু ঈর্ষার

দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাতুম? কিন্তু আমি বুঝতে পারতুম না, ওদের এই দল-বাঁধা খুশি হওয়াটাকে ঠিক বুঝতে পারতুম না। ওদের আলাপের একটা প্রধান বিষয় ছিলো স্ত্রীলোক; আমার সেটা ভালো লাগতো না। নবযৌবনের কৌতূহল, নবযৌবনের চিন্তাহীন, দায়িত্বহীন উন্মুখতা। যদি তখনকার মতো একটু বিসদৃশও হয়, দোষ দেয়া যায় না। তখন কি আমি তা বুঝতুম! ভালো লাগতো না, যে-স্বরে ওরা কথা বলতো। কেমন একটা গায়ে-পড়া এই-যে-কেমন-আছেন গোছের ভাব, জোর-করা গা-ঘেঁষাঘেঁষি যেন। আমার ভালো লাগতো না। কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা। তাতে তাদের পৌরুষের সম্মান। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'লো: সাতদিনের মধ্যে যদি তাকে চুম্বন করতে না-পারলুম তাহ'লে আর করলুম কী? 'ভালোবাসা'র কথা বলতো ওরা। তাদের অরুণা আর ইন্দিরা আর শেফালি— কী-রকম সগর্বে অসংখ্য খুঁটিনাটির বিবৃতি। তাদের আনন্দ 'ভালোবেসে' নয়, বন্ধুদের কাছে 'ভালোবাসা'র গল্প ক'রে। বন্ধুদের কাছে মান বাড়ে, নিজেকে নিজেরই কাছে মস্ত মনে হয়। এমন ছেলেও হয়, যে শুধু গল্প ক'রেই এত আনন্দ পায় যে সে-গল্প নিছক বানানো হ'লেও তার কিছু এসে যায় না। ছেলেমানুষি— কিন্তু ছেলেবয়সে একটু ছেলেমানুষি না-ক'রে উপায় কী? খুব কঠোর যেন আমরা না হই তাদের প্রতি। কিন্তু সে-সময়ে আমার মনের প্রবল বিমুখতা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারতুম না। আমি আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলুম সোনালি ফসলের সৌরভে: ভেবেছিলুম

আর-কিছুর প্রয়োজন নেই জীবনে। সে-ই ছিলো আমার ছেলে-বয়সের গর্ব। সেই গর্বে অন্ধ হ'য়ে ছিলুম। সেই বয়সে, প্রথম যৌবনের সেই ইন্দ্রধনু-সময়ে আমি কোনো মেয়ের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখিনি, কখনো মাতাল হ'য়ে উঠিনি চুলের গন্ধে, কখনো কোনো মেয়েকে চুম্বন করিনি। কখনো অন্ধকারে নরম হাতের উপর হাত রাখিনি, চুপে-চুপে বলিনি, চুপে-চুপে বলিনি—

বিয়ে যখন হ'লো, তখনও অনেক বিষয়ে আমি একেবারে কাঁচা। পৃথিবীতে সকলেরই বিয়ে হয়, আমারও হয়তো একদিন হবে। এটুকু জানতুম, এর বেশি কিছু জানতুম না। বাবাকে বিবাহিত পুরুষের রূপে দেখিনি, চোখের সামনে কোনো ছবি ছিলো না যা থেকে নিজের বিবাহিত জীবনের খশড়া এঁকে নিতে পারি। একেবারে অপ্রস্তুত ছিলুম। এমন সময় হঠাৎ বাবা বললেন। চমকে উঠলুম: তিনি যাতে বিয়ে করতে পারেন সেইজন্যে আমাকে আগে বিয়ে করতে হবে। করতেই হবে? কেন? কিন্তু আমি প্রশ্ন করলুম না। বাবার কোনো কথা লঙ্ঘন করা অসম্ভব ছিলো আমার পক্ষে। যদি আমি অস্বীকার করতুম, যদি আমি নিজের জীবনকে চাইতে পারতুম তখনই! যদি আমি অপেক্ষা করতুম—। কিন্তু বাবাকে আমি বঞ্চনা করবো কেমন ক'রে? তাঁর জীবন যখন আমার উপর নির্ভর করছে, কেমন ক'রে তাঁকে ঠেলে দিতে পারতুম? আজ এতদিন পরে তিনি যদি তাঁর নিজের জীবনকে খুঁজে পেয়ে থাকেন, আমি কি এত বড়ো দুর্ভাগা

যে তাতে বাধা দেবো? কী এসে যায় এতে, আমি ভেবেছিলুম। সব বিয়েই তো একরকম। বিয়ে করবার পরেই তো স্ত্রী। আর স্ত্রী ব'লে যাকে মানলে, তার সম্বন্ধে আর কি কিছু বলবার আছে? আমি কিছু বললুম না, মেনে নিলুম। বাবা নিলেন তাঁর নিজের জীবন, আর আমার জীবনকে আমি নিলুম তাঁর হাত থেকে। দেবতার মতো যিনি ছিলেন আমার জীবনে, তিনিই কি শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাঁকি দিলেন? যে-বিশ্বাসের শক্তিতে তাঁর নিজের বিবাহ, আমার কাছ থেকেও তিনি সেইটে আশা করলেন না কেন? তাঁর জীবনের আদর্শকে চিরকাল আমি আশ্রয় ক'রে এসেছি, শুধু এইবেলা আমাকে সেখান থেকে স্খলিত হ'তে হ'লো কেন? তাঁর পক্ষে যেটা ছিলো পৌরুষের পণ, আমার বেলায় সেটা তিনি হাতে ধ'রে তুলে দিলেন কেন, কেন অত সহজ ক'রে দিলেন? নিজের জীবন অর্জন করবার দুঃসাহস তাঁর ছিলো, কিন্তু আমাকে তা অর্জন করবার কোনো সুযোগই দিলেন না, একেবারে তৈরি ক'রে আমাকে উপহার দিলেন!

কিন্তু কে ভেবেছিলো—তখন কে ভেবেছিলো এ-সব কথা! বিয়ে যখন একবার হ'য়েই গেলো তখন আর তা নিয়ে ভাববার কী আছে? সুখ? যে-কোনো ব্যাপার থেকে কতটা সুখ পেলাম তা মাপতে যাওয়া কেন? জীবনটা সুখের দোকান নাকি ভেবেছো? আর তোমার স্ত্রীই তো তোমার জীবনের সব নয়। পুরুষ মানুষের আসল জীবন-স্রোত অন্য কোথাও, অন্য কোথাও। সেখানে তো কোনো অভাব ছিলো না আমার।

ভাগ্যের সঙ্গে অত চুলচেরা হিশেব করতে যায় কে? ভাগ্য কি কখনো সব দিতে পারে? সেই যে পাশ ক'রে প্রথম চাকরি পেলুম, সে-সময়টা তো কিছু খারাপ কাটেনি। সমস্ত জীবন আমি তা-ই নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতুম। কিন্তু থাকতে দিলে না। ঠেলে পাঠালে বিলেতে। ত্মাখো, অদৃষ্ট সব দেয় না, কিন্তু খানিকটা দেয়, অনেকখানি দেয় হয়তো। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তুমি যা চাও তা কি না-হ'য়ে পারে? আমি এককালে চেয়েছিলুম আলাদিনের সেই আশ্চর্য গুহায় অবাধে বিচরণ ক'রে বেড়াবো, চিরকালের ঐশ্বর্যরাশিতে অর্জন করবো স্বাধিকার। এ-ই যথেষ্ট এ-ই সব, এ ছাড়া আর-কিছু নেই: আমি এককালে ভেবেছিলুম। সে ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়নি? তবু হয়তো কিছু বাকি ছিলো—কিন্তু সমস্ত অন্ধকার স্বরঙ্গের দরজা আমার কাছে খুলে গেলো, মশাল হাতে নিয়ে আমি ঘুরে-ঘুরে বেড়ালাম—শাদা মানুষের দেশে।

হ্যাঁ, সমস্ত প্রাণ দিয়ে যা চাও, তা একদিন হয়তো পাবে, কিন্তু হয়তো পাবে দেরি ক'রে, পাবে ভুল সময়ে। তৃষ্ণা যখন তীব্র, তখন মরবে গলা শুকিয়ে; আর যখন তোমার মুখে ভরা পেয়ালা তুলে ধরা হ'লো, তখন হয়তো নতুন কোনো অভাব ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে। এ-রকম যদি না হবে, তাহ'লে আর অদৃষ্ট বলেছে কেন? ভাবো: সমস্ত জীবন দিয়ে তুমি যা অর্জন করলে, হয়তো দেখলে তার আর প্রয়োজন নেই, তাকে তুমি ছাড়িয়ে এসেছো। কী সর্বনাশ! এরই জন্যে কি প্রতিদিন আমি এত কষ্ট করলুম? কিন্তু জীবন যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—

সেই তো মুশকিল। হঠাৎ দেখি জীবনের দেয়ালে ফাটল ধরেছে, নতুন কামনা বাড়িয়ে দিয়েছে তার উৎসুক, সবুজ বাহু। এতদিন ধ'রে কি তবে ভুল করলুম? এতদিন ধ'রে যে-স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে রচনা করলুম তা কি ব্যর্থ হ'লো তবে? কী সর্বনাশ!

মন্ত্র আমি চেয়েছিলুম, মন্ত্র আমি পেয়েছিলুম। কিন্তু তা তো চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারলে না আমাকে। বরং সেই ভয়ংকর উজ্জ্বল অস্ত্র আমারই বুকে এসে বিঁধলো। একদিন মনে-মনে বলেছিলুম: আমি জানবো, আমি বুঝবো। মুগ্ধ হয়েছিলুম বুদ্ধির জাদুতে। সমস্ত জীবন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই তা মারতে উঠবে কে জানতো!

ছিঁড়ে ফেলো, ছিঁড়ে ফেলো জানবার আর বোঝবার এই জটিল জাল, ছিঁড়ে ফেলো। নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো, আমাকে বাঁচাও। এই তৃষ্ণার দেশে তোমার করুণা বর্ষণ করো, দেবতা। আ—কবে আমি কোন অ্যালবাট্রস মেরেছিলুম! এই তৃষ্ণা কি চিরন্তন হবে, কোনোদিন কি আকাশ ভেঙে নেমে আসবে না বৃষ্টি? এ-ই তো জীবনের চরম রূপ, আমি ভেবেছিলুম। কিন্তু এখন চারদিকে দেখছি শূন্যতা। আরো কিছু চাই, অন্য-কিছু চাই। তোলপাড় ক'রে উঠলো আমার রক্ত। চাই, চাই, তাকে না-হ'লেই আমার চলবে না। সেখানেই আমার পরিপূর্ণতা: তা না-হ'লে আমি বাঁচবো না।

তোমরা কি বলবে আমার অপরাধ হয়েছিলো? কিন্তু আমি তো কখনো প্রতিবাদ করিনি, চিরকাল জীবনকে অন্যের হাত থেকে

নিয়েই খুশি ছিলুম। তবু হয়তো আমাদের উপর ঈশ্বরের এই দয়া যে নিজেকে কখনো একেবারে হারানো যায় না, অনেক চেষ্টা ক'রেও নয়। তোমরাই বলো, এই শেষের দিনে নিজের জীবনকে কি আমি চাইতে পারতুম না? এ যে আমার মধ্যে ছিলো তা কি আমিই জানতুম? আমি তো ভেবে নিয়েছিলুম জীবনে আর-কিছু নেই, চিরকালের মতো ছাঁদ তৈরি হ'য়ে গেছে, এখন বাকি দিনগুলো শুধু তার সঙ্গে মানিয়ে চলা। কিন্তু হঠাৎ এলো জোয়ার। জোয়ার এলো রক্তে—কোথায় ভেসে গেলো পুরোনো দিনের চিহ্ন, রাশি-রাশি মৃত স্মৃতি। আমি স্বীকার করবো জীবনে এই একবার আমি চেয়েছিলুম। আমি চেয়েছিলুম, সেই চাওয়ার যন্ত্রণায় মরতে বসেছিলুম আমি।

বেঁচে গেলুম শেষ পর্যন্ত, তোমরা বলবে? হ্যাঁ, মন্দ কী, এই চোখ-ঝলসানো রোদের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকা মন্দ কী। মন্দ কী শোভার চোখ দিয়ে তার বাড়ির ছবি দেখা। কী নতুন একরকমের পাথর বেরিয়েছে, তা দিয়ে মেঝে। দেয়ালে বিস্কুট রংই সবচেয়ে মানাবে বোধ হয়? সামনে ফুলের বাগানে প্রকাণ্ড সূর্যমুখী। প্রতিবেশীরা বেড়াতে এলে কনক দাসের নতুন রেকর্ড। মন্দ কী? এতদিন এমনি ক'রেই তার জীবন কেটেছে, বাকি বছরগুলোও কাটলো না-হয়। এ তো সে গোড়া থেকেই ধ'রে নিয়েছিলো। সকলের জীবনে কি সব হয়? আর কোনো স্বপ্নে তার ঘুম ভেঙে যাবে না, আর কোনো দুঃস্বপ্ন হানা দেবে না রাত্রিকে। মন্দ কী। যা তুমি

চাও, তা-ই হবে নাকি? ভেবেছিলে অদৃষ্ট তোমার পক্ষে; ফাঁকি দিয়ে জিতে যাবে ভেবেছিলে। যে-পরিপূর্ণতা সমস্ত জীবন দিয়ে অর্জন করবার তা এমনিই তোমার কাছে আসবে, ভেবেছিলে। তা কি হয়?—তবু, তবু: আমি চাইতে পেরেছিলুম, জীবনে একবার, অন্তত একবার আমি চাইতে তো পেরেছিলুম।

—কিন্তু এ-রকম হবার কী দরকার ছিলো, এ-রকম না-হ'লেই কি হ'তো না? সমস্ত বালিশ ভ'রে ওর কালো চুল, এলো চুল। এত লম্বা ওর চুল, আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। স্নানের আগে এই চুলের মধ্যে আস্তে-আস্তে আঙুল চালিয়ে তেল মাখতো না? মনে পড়ে না কখনো দেখেছি। কেমন ক'রে তাকাতো? হাসতো কেমন ক'রে? একটু হাসি যেন লেগে রয়েছে ঠোঁটে: কী ভাবছে? আর পূর্ণেন্দুবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় বলছেন: কী হ'লো, অবিনাশ, কী হ'লো! আর কর্নেল গাঙ্গুলির কালো কোটের উপর মোটা সোনার ঘড়ির চেন চিকচিক করছে। ঝিরঝিরে সকালবেলায় বাইরে আকাশ হেসে উঠেছে। শেষরাত্রের দিকে বৃষ্টি হয়েছিলো: বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। জানলার দিকে ওর মাথা: মাঝে-মাঝে নড়ছে কালো চুল, এলো চুল।

সেই সেদিন কলেজে যাবার আগে খাবার ঘরে—ও তখনো স্নান করতে যায়নি। একগোছা চুল সামনের দিকে টেনে এনে আঙুলে জড়াচ্ছিলো। তা-ই কি? লক্ষ্য করিনি, ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখিনি। এত বেলা হ'লো, এখনো স্নান করেনি। যাচ্ছি, অবি-দা, যাচ্ছি। সেই এণ্ডির কোটটা গায়ে

ছিলো, বাবা থানটা পাঠিয়েছিলেন, কলেজ স্ট্রিটের কাটা। খুব ভালো তৈরি হয়নি হয়তো, কে জানে। আর সেই বইগুলো ঝুপ ক'রে ছড়িয়ে প'ড়ে গেলো, ও হেসে উঠলো মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে। ওর চুল কি খোলা ছিলো? ওর চুল কি ছড়িয়ে পড়েছিলো পিঠের উপর? আর ও দেশলাই জ্বেলে দু-হাতের মধ্যে ধরলে, নিচু হ'য়ে আমি সিগারেট ধরালুম। মুখ শুকিয়ে গেছে, ঘামে স্যাঁৎসেঁতে কপাল। আমার সময় ছিলো না, ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখিনি, আমার সময় ছিলো না। ওর চোখে ছিলো ক্লান্তি, দিঘির জলে যেমন বিকেলের ছায়া, আর ওর শাদা শাড়ির আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে—কেমন ওর আঙুলগুলো, দেশলাইয়ের আলোটা আড়াল ক'রে রেখেছে? সময় ছিলো না, সময় ছিলো না আমার। ও যদি কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি হ'তো, সারাবেলা কি কাটিয়ে দিতুম না ওর দিকে তাকিয়ে? এই যে আমরা বলি সৌন্দর্য, তা কী? শিল্পীর সৃষ্টি, ছবি আর মূর্তি: ইওরোপের শহর থেকে শহরে তা দেখবার জন্য ঘুরে বেড়ানো। রেখার ছন্দ, রঙের সুষমা। আর সেই একটা-কিছু যার নাম নেই, যা বুঝতে পারিনে, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকি। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকি ছবির দিকে, মূর্তির দিকে—কতদিন ধ'রে তা আছে! এই তো সৌন্দর্য, এ কি কখনো নষ্ট হ'তে পারে? এ কখনো নষ্ট হবে না, মনের মধ্যে এই আশ্বাসের শান্তি। সেই যে দেশে ফিরে এসে প্রথম ওকে দেখেছিলুম, অল্প বয়সী গাছের মতো ওর শরীর, আর আমার মনে হয়েছিলো যেন ঈশ্বরের জ্যোতির্ময়

খড়্গ ঝলসে উঠলো আমার চোখের সামনে, কী যেন আমি পেলুম, যা কখনো নষ্ট হবে না। সৌন্দর্য কি এরই নাম? কিন্তু কেমন ক'রে ওর চুল পিঠের উপর লুটিয়ে পড়তো যখন ও খোঁপা খুলে দিতো? ওকে কি আর কখনো দেখবো না? আর ইওরোপের শহরে-শহরে গির্জায় আর মিউজিয়মে সেই সব ছবি আর মূর্তি এখনো আছে, আরো কত কাল থাকবে। কী লম্বা চুল, সমস্ত বালিশ ছেয়ে আছে। আর পূর্ণেন্দুবাবু বলছেন, কী হ'লো, অবিনাশ, কী হ'লো! আর সেই তার মস্ত, শাদা বিছানায় শুয়ে শোভার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না। এটুকু শক্তি তার হয়েছিলো যাতে কাঁদতে পারে। নয়তো—এ-ধাক্কা সইতো না হয়তো। আর কর্নেল গাঙ্গুলি নিচু হ'য়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে, হাত দুটো পিছনে। ওর সেই মাছরাঙা শাড়িটা কি আছে এখনো? ভেবেছিলুম জিগেস করবো, ভুলে গেলুম। সে-জায়গাটা কত দূর এখান থেকে, যেখানে আমরা পিকনিক করতে গিয়েছিলুম? শহরের ঐ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে সরু একটা পাহাড়ি নদী, ঝরনা আসলে, কী ঠাণ্ডা জল। ছাখো, অবি-দা, একটু হাত দিয়ে ছাখো। শাড়িটা ও ভিজিয়ে ফেলেছিলো। আর কত রাত্রে চুপচাপ ফাঁকা রাস্তা দিয়ে থিয়েটার থেকে ফেরা—ও বলতো আমাকে একটু চালাতে দাও, আর স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে গুনগুন ক'রে গান করতো। ভালো একটা গাড়ি কেনবার কথা ছিলো, ঘণ্টায় সত্তর মাইল না-হ'লে আর হ'লো কী? ষোড়শী তারা দেখেছিলো যে-রাত্রে লোকে বলে শিশিরবাবুর হঠাৎ সত্যি-

সত্যি কলিক উঠেছিলো, কিন্তু বিশ্বাস করবার নয় কথাটা। সত্যিকার শারীরিক যন্ত্রণায় কি মানুষ ও-রকম করে? সত্যিকারের যন্ত্রণায় একটা লোক যদি স্টেজের উপর কাৎরাতে থাকে আমার হয়তো হাসি পাবে দেখে, কিন্তু শিশিরবাবু যখন সেই কষ্টের অভিনয় করেন। একরাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিলো, মোটরের সবুজ আলোয় বৃষ্টি ভেঙে যাচ্ছে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে, আর ও সারা রাস্তা বলতে-বলতে আসছিলো নিমচাঁদ শিশিরবাবুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টিতে ঝাপসা চৌরঙ্গি দিয়ে যেতে-যেতে চুপ ক'রে গিয়েছিলো, রাত তখন অনেক, চৌরঙ্গি একেবারে খালি, ময়দানের অন্ধকারে আলোর ফুটকি ছড়ানো, আর ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠছে হাওয়া, আর মাথা হেলিয়ে দিয়ে ও চোখ বুজেছিলো, ক্লান্ত লাগছিলো বোধহয়, ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছিলো ও, ওর চোখে কি ছায়া কাঁপছিলো না দিঘির জলে ঘনিয়ে-আসা বিকেলের মতো? কী গো, কী হয়েছে? কর্নেল গাঙ্গুলি হাসি-ভরা স্বরে জিগেস করেছিলেন, তাঁর ছোটো-ছোটো নীলচে চোখ খুশিতে নাচছে। কী খুশি তিনি হয়েছিলেন। দেখবেন, মিঃ রয়, আর মাসখানেকের মধ্যেই উনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন; এ-রকম মির‍্যাকল্ মাঝে-মাঝে ঘটে বইকি। ক্লান্ত, ও বড়ো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে: কর্নেল গাঙ্গুলিও তা-ই বলেছিলেন। এ কিছু নয়, শরীরটা নিজে থেকেই কয়েকদিনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলো। অসুখ করাটা সব সময়ই যে খারাপ তা নয়: শরীরটাকে আবার ঠিক সুরে আনবার জন্যেই মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো অসুখ। কিন্তু বেশি কষ্ট ও পায়নি,

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। মনে হ'তো না কোনোরকম কষ্ট পাচ্ছে ও। চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে থাকতো, কী গরম ওর হাত, তুমি এখানে ব'সে থাকো, তুমি এখান থেকে যেয়ো না। আর সেই ভোরের দিকে বৃষ্টি নামলো আর কর্নেল গাঙ্গুলি ওর শিয়রের জানলাটা খুলে দিলেন। আর সকালবেলার নরম আলো ওর এলোমেলো কালো চুলের উপর। কী মস্ত খোঁপা হ'তো, এক-একদিন গাড়িতে ওর পাশে ব'সে হঠাৎ চোখে পড়তো।—কিন্তু কে মনে রাখবে, কে মনে রাখবে ওর চুল? আমিই বা ক-দিন মনে রাখতে পারবো?